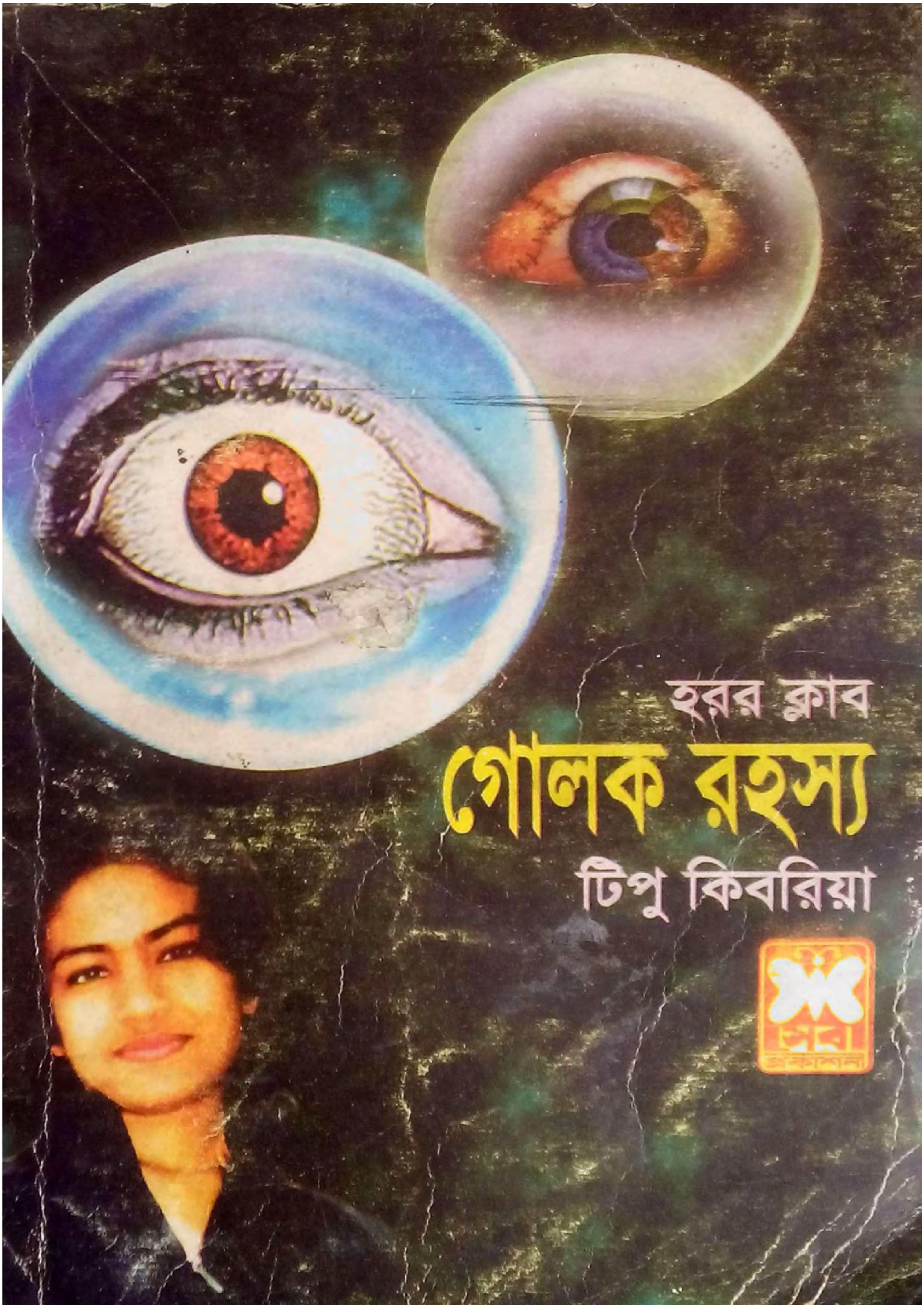
হরর ক্লাব
গোলক রহস্য
টিপু কিবরিয়া
সেবা প্রকাশনী

কিশোর হরর

[হরর ক্লাব]

গোলক রহস্য

টিপু কিবরিয়া

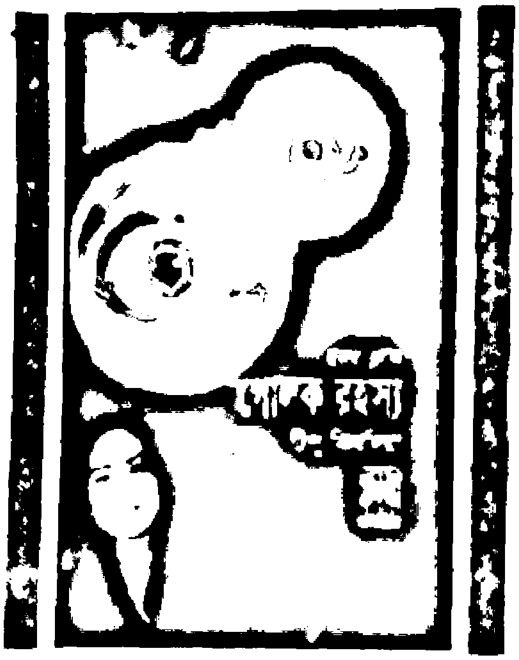

সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

ISBN 984-16-1545-2

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: লেখকের

প্রথম প্রকাশ: ২০০৫

প্রচ্ছদ: বিদেশী ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৮৯৪০৫৩ (M-M)
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
E-mail: sebaprok@citechco.net
Web Site: www.ancbooks.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

GOLOK RAHOSHYO
A Horror Novel
By: Tipu Kibria

আটাশ টাকা

আমার নাম জ্যোতি।
হ্যাঁ, 'জীবন্ত মমি' আর 'পিরামিডের আতঙ্কের' জ্যোতি।
সেই যে মিশরের গ্রেট পিরামিড চেম্বারে–
না থাক, সে কাহিনী তো তোমরা জানোই।
তোমাদের জন্য একটা সুখবর আছে!
আমরা একটা ক্লাব খুলেছি, নামঃ

হরর ক্লাব।

আমি জানি, আমাদের ক্লাবের অন্য সদস্যদের নাম শুনলে
তোমরা আরও খুশি হয়ে উঠবে।
কারণ ওরা তোমাদের অত্যন্ত পরিচিত–
'অতৃপ্ত প্রেতাত্মার' তিয়ানা, 'বৃক্ষমানবের' উর্মি,
'জাদুর ঘড়ির' রাজা, 'নেকড়েমানবের' উপম,
'অদৃশ্য বন্ধুর' ইমরান আর 'পাশের বাড়ির ভূতের' সৌরভ।

যেখানে রহস্য, সেখানেই আমরা।
হোক তা রোমাঞ্চকর, অলৌকিক,
কিংবা বাস্তব গোয়েন্দাগিরি।

ভয় পেতে যারা ভালবাসো,
এবং ভালবাসো রহস্য-রোমাঞ্চ আর গোয়েন্দা কাহিনী,
চলো আমাদের সাথে,
হরর ক্লাবের সবাই তোমাদের সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছে।

লেখকের আরও ক'টি বই

কিশোর হরর

অতৃপ্ত প্রেতাত্মা, বৃক্ষমানব, অভিশপ্ত ক্যামেরা
জীবন্ত মমি, তান্ত্রিকের কবলে, পাশের বাড়ির ভূত
অদৃশ্য বন্ধু, জাদুর ঘড়ি, অলৌকিক শক্তি
নেকড়েমানব, পিরামিডের আতঙ্ক, আয়নার ওপাশে
জল্লাদের হাসি, সাগর বিভীষিকা, সেই অভিশপ্ত ক্যামেরা
ভুতুড়ে সৈকত, ভয়ানক দুঃস্বপ্ন, রাত্রি যখন গভীর
অগ্নিপরীক্ষা, বিপদের মুখোমুখি, আতঙ্কের রাত
ঘুমালে বিপদ, আরেক পৃথিবী, ড্রাকুলার নিঃশ্বাস
বেড়ালের কান্না, মমির অভিশাপ, বিপজ্জনক বর্ম
ডাইনীর চোখ, অদৃশ্য আততায়ী, জিন্দালাশ
রত্নগড়ের রহস্য, আকাশপ্রেত, অজানা আতঙ্ক, নকল জ্যোতি, কবরের আতঙ্ক, ভিনগ্রহের ভয়ঙ্কর, ভয়াল জন্তু।

ওয়েস্টার্ন

অশুভ চক্র, হুমকি

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া, কোনভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

এক

'তোমাদের ভয় করছে না তো?' সরোয়ার হোসেন জিজ্ঞেস করলেন। জোর বাতাসে চুল উড়ছে তাঁর। 'করলে বলো আরেকটু নীচে নেমে যাই।'

জ্যোতি হেসে মাথা নাড়ল। 'না, না। এখানেই ঠিক আছে, আঙ্কেল। ভয় করছে না।'

'আমারও করছে না,' রাজা মুহূর্তের জন্য বাবল গাম চিবানো বন্ধ রেখে সরোয়ার সাহেবের দিকে তাকাল।

'আমারও না,' বলল উপম।

গাঢ় কমলা রঙের পেট মোটা বিশাল এক বেলুনে চড়ে আকাশ ভ্রমণে বেরিয়েছে ওরা তিন বন্ধু—জ্যোতি, উপম আর রাজা। সঙ্গে বেলুনের মালিকও আছেন। জ্যোতির বাবার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু তিনি। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত মাস্টার ওয়ারেন্ট অফিসার, সরোয়ার হোসেন।

'আঙ্কেল, আর উপরে ওঠা যায় না?' একটু পর জ্যোতি প্রশ্ন করল।

'যায়,' মাথা দোলালেন সরোয়ার হোসেন। 'কিন্তু এখনই ওঠা যাবে না। একটু পরে উঠব। কারণ এখন প্লেন উড়বে,' হাত তুলে

দূরের খুদে এয়ারপোর্ট দেখালেন। 'ওই দেখো! কক্সবাজার থেকে চট্টগ্রাম হয়ে ঢাকায় যাবে ওটা।'

সেদিকে তাকাল ওরা। এয়ারপোর্টের টারম্যাকে একটা পিচ্চি বিমান দাঁড়িয়ে আছে। কোন প্রাইভেট বিমান কোম্পানির বিমান মনে হয়। ফোকার-২৮ বা এটিপি বিমানের চেয়ে আকারে বেশ ছোট। দূর থেকে একটু বড়সড় খেলনা বিমানের মত লাগছে ওটাকে। টার্মিন্যাল ভবন থেকে যাত্রীরা একজন-দু'জন করে বেরিয়ে এসে উঠছে।

শহরের রাস্তায় প্রচুর বাস-মিনিবাস আর ট্রাক চলছে দেখল ওরা। রিকশা-স্কুটারও চলছে।

'প্লেন ওঠা-নামার সময় এয়ারপোর্টের ধারেকাছে যাওয়া কড়াকড়িভাবে নিষেধ আছে। বেশি উপরে ওঠার ব্যাপারেও নিষেধাজ্ঞা আছে,' ওদেরকে বোঝালেন বেলুন মালিক। 'তাতে দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার ভয় থাকে।'

জ্যোতি মাথা দোলাল। 'বুঝতে পেরেছি। এখন আমরা কত ফুট উপরে আছি?'

বেলুনের খুদে আলটিমিটারের নীল নিডলের উপর চোখ বুলিয়ে নিলেন তিনি। 'বেশি না। মাত্র চল্লিশ গজ। মানে, একশো বিশ ফুটের মত।'

শখের বেলুনিস্ট সরোয়ার সাহেব। চাকরিতে থাকার সময় একবার ট্যুরে মিলানে গিয়েছিলেন তিনি। পাঁচ সপ্তাহের মত থাকতে হয়েছিল সেখানে। সে সময় ইটালিয়ানদের বেলুনে চড়া দেখে এই শখের জন্ম হয়।

'প্রথম প্রথম যখন বেলুন নিয়ে উড়তাম,' সরোয়ার সাহেব বললেন, 'তখন এয়ারপোর্ট কর্তৃপক্ষ খুব বাধা দিয়েছিল। পরে ঢাকায় গিয়ে সিভিল এভিয়েশন থেকে এ জন্য বিশেষ অর্ডার নিয়ে আসতে হয়েছে আমাকে। ওরা বিশেষ কিছু শর্তে ওড়ার লাইসেন্স দিয়েছে।'

উপর থেকে অদ্ভুত সুন্দর লাগছে কক্সবাজারের নৈসর্গিক দৃশ্য। ছবির মত। তবে ছবিটা একটু একটু দুলছে। কারণ বাতাসে দোলনার মত দোল খাচ্ছে বেলুন।

ছবিটার বেশিরভাগ অংশ জুড়েই আছে আদিগন্ত নীল পানির বিস্তার—বঙ্গোপসাগর। যতদূর চোখ যায়, শুধু নীল আর নীল পানি। বেশ কয়েকটা জাহাজ আর দুটো বিশালাকার লবণবাহী ট্রলার আছে সাগরে। অজানার পানে চলেছে। সেগুলোর মাস্তুল আকাশে খাড়া হয়ে আছে তর্জনীর মত।

সরোয়ার সাহেবের বাড়ি এখানেই। চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর নিজের পৈতৃক ভিটায় এসে বাস করছেন। ছেলেমেয়ে নেই। স্বামী-স্ত্রী দু'জনের সংসার। সময় কাটতে চায় না। তাই দিনের বেশিরভাগ সময় এইসব নিয়ে কাটান তিনি।

বেলুনে চড়ে আকাশ ভ্রমণ করা বাংলাদেশে যেমন অভিনব, তেমনি বিস্ময়করও। কক্সবাজারে তো আরও বিস্ময়কর। কাজেই জিনিসটা এখানে এত খ্যাতি এনে দিয়েছে তাঁকে যে সবাই 'বেলুন সরোয়ার' নামে চেনে ভদ্রলোককে।

বেলুনে চড়ার মত আরও একটা শখ আছে তাঁর। সেটা হলো মাছ ধরা।

বাতাসের টানে আবার এদিক-ওদিক দুলতে শুরু করল বেলুন। দুলছে নীচের সবকিছু।

কক্সবাজারের অপরূপ নৈসর্গিক দৃশ্য বিমান থেকেও দেখা আছে ওদের। কিন্তু সে সময় চারদিক এত ভাল, এত স্পষ্টভাবে দেখা যায় না, যতটা এই মুহূর্তে দেখা যাচ্ছে বেলুনের খোলা বাস্কেট থেকে।

ছোট শহর কক্সবাজার। পরিকল্পনাবিহীন, যেমন-তেমনভাবে গড়ে উঠেছে। তারপরও বেশ ছিমছাম। প্রচুর নতুন নতুন ইমারত নির্মিত হচ্ছে। কল-কারখানা তেমন নেই, ফলে বিষাক্ত ধোঁয়াও অনুপস্থিত।

এখানকার সমুদ্র-সৈকত বিশ্বের দীর্ঘতম সৈকত। এখানে প্রচুর হোটেল-মোটেল আছে। সৈকতে সব সময় দর্শনার্থীদের ভিড় লেগে থাকে। তবে দেখার মত ভিড় হয় সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের সময়।

কলাতলির দিকে লাইন দিয়ে অনেকগুলো হ্যাচারি আর নার্সারি দেখতে পেল ওরা। হ্যাচারিতে কৃত্রিমভাবে চিংড়ি মাছের পোনা উৎপাদন হয়, ওদেরকে বোঝালেন সরোয়ার হোসেন। আর নার্সারিতে পোনার পরিচর্যা করা হয়। ও দুটোর কোনটাই পরিবেশ দূষণ করে না।

দূরে কিছু চিকচিক করে উঠতে ঘুরে তাকাল ওরা। প্লেনটা উঠে পড়েছে আকাশে। বড় একটা বাঁক নিয়ে রওনা হয়ে গেছে নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে।

এবার নিশ্চিন্তে বেলুনের উচ্চতা বাড়াতে লাগলেন সারোয়ার

সাহেব। হু-হু করে উঠে যেতে লাগল বেলুন। দেখতে দেখতে পাঁচশো ফুট উপরে উঠে এল। চোখেমুখে ভেজা ভেজা মেঘের ছোঁয়ায় রোমাঞ্চিত হলো ওদের শরীর। শিহরণ জাগছে।

বাতাসের টানে কিছুক্ষণের জন্য কাত হয়ে থাকল গাঢ় কমলা রঙের বিশাল বেলুনটা। দূর থেকে নিশ্চয়ই কাত হয়ে থাকা বড় একটা বিস্ময় চিহ্নের মত লাগছে ওটাকে, ভাবল জ্যোতি।

দড়ির মাথায় ঝোলানো গনডোলায় শক্ত করে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে সবাই–সরোয়ার সাহেব, জ্যোতি, উপম আর রাজা। ঘড়ির পেন্ডুলামের মত দোল খাচ্ছে গনডোলা।

কিছুক্ষণ পর বাতাসের চাপ কমতে আবার সোজা হলো বেলুন। আশ্বস্ত হয়ে নীচে তাকাল ওরা। সৌরভ, ইমরান, ঊর্মি ও তিয়ানাকে দেখতে পেল। এখন একদম ছোট হয়ে গেছে ওরা। লিলিপুটের মত লাগছে।

আলপিন আকারের হাত নাড়ছে শূন্যে। ওদের সঙ্গে স্থানীয় কিছু ছেলে-মেয়েও আছে। ওদেরই বয়সী। সরোয়ার সাহেবের প্রতিবেশী।

ঢাকা থেকে 'হরর ক্লাবের' পুরো ব্যাটেলিয়ান কক্সবাজারে বেড়াতে এসেছে এবার, দু'সপ্তাহের জন্য। সবাই সরোয়ার সাহেবের বাড়িতে উঠেছে। কাজেই এখন তিনি মহাব্যস্ত। দিনের বেশিরভাগ সময় ওদেরকে নিয়ে আকাশ ভ্রমণ করেন।

এখন আর মাছ ধরার সময় নেই তাঁর। ওদের সঙ্গে গল্প করে আর বেলুনে উড়ে বেড়িয়েই সময় বেশ ভালভাবে কেটে যায়।

আটটা থেকে দশটা পর্যন্ত সৌরভদের ওড়ার পালা ছিল।

এখন জ্যোতি, রাজা আর উপমের।

কিছুক্ষণ পর হঠাৎ কালো মেঘের মধ্যে ঢুকে গেল বেলুন। ঘন কালো মেঘ।

উপম ঢোঁক গিলল সশব্দে। বেলুনের খোলা মুখের কাছে জ্বলন্ত আগুনের শিখাটার দিকে তাকাল। ওই শিখার বাড়া-কমার উপরে নির্ভর করে বেলুনের উচ্চতা।

'ঘটনা প্যাঁচ খেয়ে গেল না তো?' সেদিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বলল উপম।

জ্যোতি আর রাজাও তাকাল সেদিকে। ফড়ফড় শব্দ করছে নজ্‌ল্ থেকে বের হওয়া আগুন-শিখা মাথা দোলাচ্ছে বাতাসে। বাতাস বেশি উত্তপ্ত করে দেওয়ার ফলে আরও ফেঁপে উঠেছে বেলুনের পেট।

রাজার বাবল গাম চিবানোর গতি বেড়ে গেছে। জ্যোতি সরোয়ার সাহেবের দিকে তাকাল। তাঁর মুখে কোনরকম চিন্তার ছাপ দেখা গেল না। একদম স্বাভাবিক।

রাজা চোখের সামনে দিয়ে উড়ে যাওয়া মেঘ নিয়ে খেলা করতে লাগল–মুঠো করে ধরছে, আঙুলকে ছুরি বানিয়ে কেক কাটার মত করে কাটছে।

বারোটার সামান্য আগে হাতঘড়িতে টোকা দিয়ে ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন সরোয়ার সাহেব। 'এবার নামতে হয়।'

জ্যোতি মাথা দোলাল। নব ঘুরিয়ে নজেলের গরম বাতাস বের হওয়ার পথ সঙ্কুচিত করে দিলেন তিনি। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বেলুনের স্ফীতি কমে গেল। নীচের দিকে নামতে শুরু করল ওটা।

দুই

স্থানীয় ছেলে-মেয়েদের মধ্যে টিরা নামের একটা মেয়েও আসে ওদের কাছে। শহরের আরেক প্রান্তে ওদের বাসা। মেয়েটা খুবই সুন্দরী। মায়াভরা, মিষ্টি চেহারা। অত্যন্ত শান্ত-শিষ্ট, নিরীহ গোছের।

সবকিছু মিলিয়ে এতই সুন্দরী একটা মেয়ে যে উর্মি আর তিয়ানা পছন্দ করে না ওকে। না, অপছন্দ করে বলা ঠিক হবে না। কথাটা অন্যরকম হয়ে যায়।

আসলে 'হরর ক্লাবের' সঙ্গে জড়িত বলে ওদেরকে প্রতিনিয়ত এমন সব অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হয়, এমন সব পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হয়, যা ওই বয়সের সাধারণ ছেলেমেয়েরা হয়তো ভাবতেই পারে না। কাজেই উর্মি-তিয়ানা বয়সের তুলনায় মানসিকভাবে অনেক পরিপক্ক।

কেউ একজন ওদের তুলনায় দেখতে সুন্দর বলে তাকে অপছন্দ করতে হবে, এমন সস্তা হীনম্মন্যতায় ভোগে না ওরা। তবে কিছুটা হিংসায় যে ভোগে, তা স্বীকার করার মত সৎসাহসও ওদের আছে।

ওটা মেয়েলী হিংসা! সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি। সেখানে ওদের কোন

হাত নেই।

অসম্ভব সুন্দরী। তারওপর অদৃশ্য একটা জৌলুস, একটা উজ্জ্বলতা সব সময় ঘিরে থাকে ওকে।

মেয়েটার মাথায় রাশি রাশি চুল। এত কালো আর চকচকে, মনে হয় যেন সিলকের তৈরি। চোখের রঙ নীলচে। অনেকটা চাঁদের উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত রাতের আকাশের মত। আবার পাহাড়ী পুকুরের টলটলে পানির মত পরিষ্কার–যার একেবারে তলা পর্যন্ত দেখা যায়।

উর্মি-তিয়ানার চেয়ে একটু খাট মেয়েটা, তবে চলাফেরার মধ্যে কেমন একটা কর্তৃত্বের ভাব আছে বলে ওর উপরেই সবার চোখ পড়ে আগে। তাই বলে কারও উপর কর্তৃত্ব ফলাতে যায় না টিরা, বরং নিজেকে গুটিয়েই রাখে।

কক্সবাজারে আসার পরদিন সমুদ্র সৈকতে ওর সঙ্গে পরিচয় হয় হরর ক্লাব সদস্যদের। একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছিল লাজুক, মৃদুভাষী মেয়ে টিরা।

প্রথম দর্শনেই ওদের সবার ভাল লেগে যায় মেয়েটাকে।

কথায় কথায় জানা গেছে, শহরের অপর মাথায় থাকে টিরা। কোথায়, তা অবশ্য জানা যায়নি। ওরা জানতে চায়নি, টিরাও বলেনি। মা-বাবা আর টিরা। এই তিনজনের সংসার ওদের। বাবা সাধারণ এক চাকরিজীবী।

পরদিন থেকে ওদের সঙ্গেই দিন কাটাতে লাগল মেয়েটা। আজ নিয়ে তিনদিন। সকালে আসে, সন্ধের আগে চলে যায়।

টিরাই লেকটার কাছে প্রথম নিয়ে গিয়েছিল ওদেরকে। তাতে

সবার মনে হয়েছে, মেয়েটা এখানে একেবারে নতুন নয়। আগেও এসেছে। ঠিক ওদের ধারণারই প্রতিফলন ঘটল যখন টিরা জানাল, এক সময় এই লেকের কাছেই থাকত ওরা।

লেকটা অদ্ভুত। স্বচ্ছ, টলটলে পানি, অথচ মাছ বা আর কোন জীবন্ত প্রাণী নেই ওটায়। অনেক খুঁজেও তেমন কিছু দেখাতে পায়নি ওরা। ব্যাঙ, শামুক বা এমনকি একটা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পোকা, তা-ও না।

ওদের ধারণা, এর পিছনে হয়তো কোন রহস্য আছে। অথবা পানিতে কোন উপাদানের অভাব আছে যে জন্য জ্যান্ত কোন প্রাণী থাকতে পারে না। বাঁচে না।

সেদিন বিকেলে দল বেঁধে হাঁটতে হাঁটতে লেকের দিকে চলল ওরা। জ্যোতিরা সাতজন, টিরা এবং আরও কিছু স্থানীয় ছেলেমেয়ে। দূর থেকে লেকের টলটলে পানি চোখে পড়তে বেশিরভাগ ছেলেমেয়ে হই-হই করে ছুটে গেল সেদিকে।

ঊর্মি, তিয়ানা ও টিরা গল্প করতে করতে অন্যদের চেয়ে খানিকটা পিছিয়ে পড়ল।

'কত বছর আগে এখানে থাকতে তোমরা?' প্রশ্নটা তৃতীয়বারের মত করল ঊর্মি।

শ্রাগ করল টিরা। 'ছিলাম। আগে।'

'কত আগে?' তিয়ানা প্রশ্ন করল।

'আমি তখন অনেক ছোট ছিলাম।'

'সে আর কত আগেই বা হবে!' ঊর্মি বলল। 'এই জায়গা দেখলে তো মনেই হয় না এখানে কখনও বসতি ছিল।'

'ছিল, ছিল!' টিরা বলল।

'এখান থেকে চলে গেলে কেন তোমরা?' তিয়ানা বলল।

'বাবার অফিস দূরে হয়ে যায়, তাই।'

'উনি কীসে চাকরি করেন?' উর্মি বলল।

'সরকারী চাকরি, না প্রাইভেট?' প্রশ্নটা করল জ্যোতি। ও আর রাজা দল থেকে ইচ্ছে করেই পিছিয়ে রয়েছে।

জবাব দেওয়ার আগে রাজার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসল টিরা। অদ্ভুত সুন্দর হাসি ওর। কিন্তু জবাব দেওয়ার কোন গরজ দেখা গেল না ওর মধ্যে।

'কীসে কাজ করেন তোমার বাবা, বললে না?'

একে একে সবার দিকে তাকাল মেয়েটা। ওরাও তাকিয়ে আছে। 'চাকরি করেন, এইটুকুই জানি আমি,' অসহায় ভঙ্গি করে দুর্বল এক টুকরো হাসি দিল টিরা। 'এর বেশি কিছু জানি না, সত্যি।'

ভুরু কুঁচকে উঠল উর্মির। 'শহরের কোথায় তোমার বাবার অফিস?'

'জানি না।'

'সে কী!' উর্মি থেমে পড়ল। সামনে এসে পড়া কিছু চুল কানের পাশে গুঁজে দিয়ে ঘুরে তাকাল মেয়েটার দিকে। দৃষ্টিতে প্রবল বিস্ময় আর কৌতুক। ঠোঁটকাটা বলে দলের মধ্যে সুনাম এবং দুর্নাম, দুটোই আছে উর্মির।

যাকে যা বলার, লুকোছাপা না করে মুখের উপর বলে ফেলে। কে খুশি হলো কে বেজার হলো, পরোয়া করে না। এ ব্যাপারে কাউকে ছাড় দেয় না। তেমনি সাহসেরও কোন অভাব নেই ওর।

'তোমার বাবা কীসে চাকরি করেন তুমি জানো না?' বলল ও। 'এটা কোন কথা হলো?'

'ঠিকই তো!' জ্যোতি মাথা দোলাল। 'তাছাড়া কক্সবাজার বড় কোন শহরও না, অফিস আছে হাতে গোনা কয়েকটা। তার মধ্যে কোনটায় তোমার বাবা কাজ করেন, তা জানা কঠিন কোন ব্যাপারও না।'

'আমার বাবার চাকরিটা খুব গোপনীয় ছিল,' ইমরানের গলা শুনে ঘুরে তাকাল ওরা। সামনের গোটা দলটা কখন যে পিছিয়ে এসেছে, ওদের আলোচনা শুনছে, টের পায়নি কেউ। 'তাঁর অফিস কোথায়, জানতাম না। বাবার কাছে অনেকবার ঠিকানা জানতে চেয়েছি, উনি বলেননি। আমার ক্লাসের সবাই তাদের বাবার অফিস অথবা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান চেনে অথচ আমি চিনি না, এ কোন কথা হলো? একদিন ফলো করলাম বাবাকে, অফিস খুঁজে বের করলাম। তারপর শান্তি!' দাঁত কেলিয়ে হাসল ইমরান। 'তুমিও একদিন তাই করো না কেন?'

কিছুক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থাকল টিরা, তারপর শ্রাগ করল। 'আমি আসলে বাবা কী করেন না করেন, সে ব্যাপারে আগ্রহী নই। তাই কখনও জানার চেষ্টাও করিনি।'

'এটা কোনও অস্বাভাবিক ব্যাপার না,' জ্যোতি বলে উঠল। 'এরকম হতেই পারে।'

'তোমাদের বাসা কোথায়?' সৌরভ প্রশ্ন করল।

'শহরে!' কিছুটা বিরক্ত মনে হলো মেয়েটিকে।

'সে তো বুঝলাম,' উপম এক পা এগিয়ে এল। 'শহরের

কোথায়? কোন রাস্তায়?'

এতজনের পুলিশী জেরার মুখে পড়ে টিরা রীতিমত বিব্রত বোধ করতে লাগল। মাথা নিচু করে নিল। তাই দেখে রাজা এগিয়ে এল ওকে উদ্ধার করতে।

'আহ্, থাম তো তোরা!' ওদের এবং টিরার মাঝখানে জাতিসংঘের মত দাঁড়িয়ে গেল রাজা। 'চান্স পেয়ে যে একেবারে ভারী বোমাবর্ষণ শুরু করে দিলি দেখছি। এসব কী? সবে নতুন পরিচয় হলো, একদিন-দু'দিনের মধ্যে এসব প্রশ্নের উত্তর আপনাআপনিই তো পাওয়া যাবে। সে জন্য এত জেরা করার কী দরকার? আমাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে ওকে পুরো জীবন-বৃত্তান্ত শোনাতে হবে নাকি?'

'কেউ ওকে জেরা করেনি,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল ঊর্মি। 'কেউ ওর জীবন-বৃত্তান্তও শুনতে চায়নি। কিন্তু নতুন বন্ধুর নাম-ঠিকানা জানতে চাওয়ার মধ্যে দোষটাই বা কোথায় হলো শুনি?'

'ঊর্মি আপু, তুই খুব কড়া কড়া কথা বলিস,' সৌরভ বলল। 'শুনলে আমার গা চুলকায়।'

ওর সরস মন্তব্যে পরিবেশ অনেকটা সহজ হয়ে উঠল। সবাই হি-হি করে হেসে উঠল। এমনকি ঊর্মি আর টিরার মুখেও হাসির আভাস ফুটল। আড়চোখে ঊর্মির দিকে তাকাল মেয়েটি।

'টিরা, তুমি ভাই কিছু মনে কোরো না,' তিয়ানা কাছে গিয়ে ওর এক হাত ধরল মেয়েটার। বলল, 'আমরা মানুষগুলো ছোট হলেও আমাদের সংগঠন কিন্তু যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। তাই আমরা নতুন কোথাও গিয়ে কারও সঙ্গে বেশি ঘনিষ্ঠ হওয়ার আগে তার

সম্পর্কে যতদূর সম্ভব জানার চেষ্টা করি। কারণ সবাই ভাল চোখে দেখে না আমাদেরকে। অনেকে ক্ষতি করতেও চায়। কিছুদিন আগে এরকম এক কাণ্ড ঘটেছিল, জানো? টাঙ্গাইলে এক অদ্ভুত মেয়ে কী সব করে উর্মি আপুকে রাতের বেলা বিড়াল বানিয়ে ফেলেছিল।'

'কাজেই বুঝতেই পারছ তুমি!' বলে কাঁধ ঝাঁকাল জ্যোতি। 'উর্মি আপু অন্যায় কিছু করেনি। অবশ্য তুমি যে আমাদেরকে কিছু বানাতেই এসেছ, তেমনটাও মনে করি না আমরা। তবু নতুন জায়গা তো, তাই...'

উর্মির দিকে তাকাল টিরা, তারপর জ্যোতির দিকে ফিরে হাসল। 'তা নিয়ে শুধু শুধু কোন চিন্তা কোরো না তোমরা। মনে করো, আমার মা-বাবা অশরীরী কিছু এবং আমি কোন ভৌতিক বাড়িতে থাকি। খুব শিগ্‌গিরই সেখানে তোমাদেরকে নিমন্ত্রণ করব আমি। হলো?'

ওর মুখে অর্থপূর্ণ হাসি দেখে আরেকবার হাসল সবাই। পরিবেশ আরেকটু হালকা হলো।

'তোমার কোন ভাই-বোন আছে?' রাজা বলল। 'মানে, তোমরা ক'ভাই-বোন?'

আবার মাথা নামিয়ে নিল টিরা। উত্তরটা ঘুরিয়ে দিল, 'হ্যাঁ। আমার পরিবার অনেক বড়।'

তিন

ফেব্রুয়ারি মাস প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। তবু শীত পুরোপুরি কাটেনি এবার। বাতাসে তার একটু একটু ছোঁয়া এখনও আছে। সেটা আজ দুপুরের পরে আরও বেড়েছে। কারণ আকাশে হঠাৎ করে ঘন কালো মেঘের আনাগোনা শুরু হয়ে গেছে। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে হিমশীতল বাতাস।

ওই অবস্থার মধ্যেও দুপুরে খেয়ে-দেয়ে আবার বের হওয়ার জন্য তৈরি হলো ওরা। আকাশের অবস্থা দেখে সরোয়ার সাহেব মৃদু আপত্তি করেছিলেন। তারপরও বেরিয়েছে ওরা। আবার কবে কক্সবাজারে আসা হবে তার ঠিক কী! অতএব কেন শুধু শুধু একটা দিন বাসায় বসে নষ্ট করা?

তাই শীতই হোক আর বৃষ্টিই হোক, ঘরের মধ্যে বন্দি থেকে সময় নষ্ট করতে রাজি নয় ওরা।

ড্রইং রুমে টিরাকে বসা দেখে খুশি হলো ওরা। 'তুমি কখন এলে?' ঊর্মি বলল।

'এই তো, এইমাত্র।'

'আমরা ঘুরতে যাব। তুমি যাবে আমাদের সঙ্গে?'

'অবশ্যই!' হাসল টিরা।

তিয়ানা বলল, 'কিন্তু গরম কিছু পরে আসোনি কেন? বাইরে তো বেশ ঠাণ্ডা।'

পাতলা সুতি কাপড়ের একটা জামা পরে আছে মেয়েটা। গরম কাপড়ের নাম-গন্ধও নেই। অথচ শীতও করছে না ওর। একদম স্বাভাবিক। যেন শীত বলে কোনকিছুর অস্তিত্ব নেই পরিবেশে।

'কই, আমার ঠাণ্ডা লাগছে না তো!'

'তুমি যাই বলো,' তিয়ানা বলল। 'আমি গরম কাপড় না পরে যাচ্ছি না।'

শুধু তিয়ানা নয়, একে একে দলের সবাই গরম কাপড় পরে নিল। ঊর্মি টিরাকে নিজের একটা সোয়েটার দিতে চেয়েছিল, নিল না মেয়েটা। একটু পর বেরিয়ে পড়ল ওরা। কোন্‌দিকে যাবে ভাবছে, এমন সময় টিরা লেকের দিকে যাওয়ার প্রস্তাব দিল।

সেদিকেই চলল ওরা। জায়গাটা শহরের দক্ষিণে, সারোয়ার সাহেবের বাড়ি থেকে মাইলখানেক দূরে। এরমধ্যে মেঘে আকাশ ছেয়ে গেছে। একদম নীচে নেমে এসেছে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ। যেন পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে।

ওরা লেকে পৌঁছতে পৌঁছতে প্রায় বিকেল হয়ে গেল। আর বেশি সময় থাকার উপায় নেই। সন্ধ্যার আঁধার নামার আগে বাসায় ফিরতে চাইলে বড়জোর এক ঘণ্টা, তার বেশি না। কারণ অজানা-অচেনা জায়গায় সন্ধ্যার পর বাইরে থাকাটা কোন বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। কখন কী ঘটে যায় কে জানে!

'চলো, ওদিক থেকে ঘুরে আসি,' দীর্ঘ লেকের ও মাথার নিচু

একটা পাহাড় দেখাল টিরা। 'অনেকদিন যাওয়া হয় না ওদিকে। আগে এদিকে যখন থাকতাম, তখন রোজ যেতাম।'

'তখন না তুমি ছোট ছিলে বলছিলে?' ঊর্মি বলল। চেহারায় সন্দেহ ফুটল।

'ওদিকে আছে কী?' জ্যোতি প্রশ্ন করল। 'গাছ-পালা কিছুই তো নেই। শুধু শুধু গিয়ে কী হবে?'

'তারচে' এখানেই বসা যাক,' ইমরান প্রস্তাব দিল। 'কিছুক্ষণ গল্প করে ফিরে যাব।'

কিন্তু কথাটা টিরার পছন্দ হয়নি বুঝতে পেরে জ্যোতি বলল, 'তুমি ওপারে যেতে চাইছ কেন? বিশেষ কিছু আছে নাকি ওখানে?'

টিরা সে প্রশ্নের জবাব দিল না। শ্রাগ করে বলল, 'না। আসলে অনেকদিন যাই না তো ওদিকে, তাই আজ একটু ইচ্ছে হলো আর কী! এখনই বাড়ি ফিরে যেতে চাইছি না আমি। তোমরা ইচ্ছে হলে চলে যেতে পারো। আমি একাই ফিরতে পারব।'

'বলে কী!' উপম বলে উঠল। 'কী সব প্যাঁচ লাগানোর মত কথা!'

'আমরা চলে যাব আর তুমি একা একা শহরে ফিরবে?' ঊর্মি বলল। 'এ কোনও কথা হলো?'

'ঠিক আছে,' রাজা বলল নাটকীয় ভঙ্গিতে। 'তোরা যেতে চাইলে চলে যা। আমি থাকছি টিরার সঙ্গে। আমি ওকে ওর বাসায় পৌঁছে দেব।'

'অ্যাঁ!' উপমের চোয়াল ঝুলে পড়ল। 'কী বললি! তুই টিরাকে পাহারা দিবি? তা হলে তোকে পাহারা দেবে কে?'

'চুপ কর, ব্যাটা ফাজিল!' চাপা ধমক লাগাল রাজা। 'বেশি কথা বলে!'

'থাম তোরা,' ঊর্মি ওদের মাঝখানে এসে দাঁড়াল। 'ঝগড়া করতে হবে না। আমরা এখনই যাচ্ছি না। আরও কিছুক্ষণ অন্তত থাকছি।' জ্যোতির দিকে ফিরল। 'এত তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে আমারও ইচ্ছে করছে না। কেবলই না এলাম!'

'তা হলে আর কী!' জ্যোতি বলল দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে। 'চল, দেখে আসি ওপারে কী আছে।'

টিরা মনে হলো খুশিই হয়েছে ওদের সিদ্ধান্তে। পার ধরে নীরবে লেকের আরেক মাথার দিকে এগিয়ে চলল আটজন কিশোর-কিশোরী।

লেকটা প্রায় সিকি মাইলের মত লম্বা। মানুষের তৈরি নয়, প্রাকৃতিক। তীরে হাঁটাচলার ভাল রাস্তা আছে। হাঁটু সমান, কোমর সমান ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে অবশ্য। তবে পথ খুঁজতে হয় না। জায়গামত পৌঁছতে বেশি সময় লাগল না।

দিনের আলোয় টান ধরেছে এরই মধ্যে। পাঁচ-দশ মিনিটের মধ্যে ফিরতি পথ না ধরলে সন্ধ্যার আগে বাসায় পৌঁছানো মুশকিল হয়ে যাবে। টিরার নির্দেশিত পাহাড়টার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে দলটা, এমন সময় সামনে কিছু একটা দেখে থমকে দাঁড়াল জ্যোতি। হাত তুলে অন্যদেরকেও দাঁড় করাল।

'ওগুলো কী?' ফিস-ফিস করে বলল ও।

আট জোড়া চোখ আটকে গেল। ওদের গজ পঞ্চাশেক সামনে, মাটি থেকে দশ গজ উপরে ফুটবলের মত কিছু আলোর বল ভেসে বেড়াচ্ছে। সবগুলো বলের বেড় প্রায় একইরকম, দেড় ফুটের মত। বিভিন্ন রঙের বল। বড় বড় গাছের আড়ালে রয়েছে ওগুলো, খোলা জায়গায় নয়।

সাদা, হলুদ, লাল, কমলা!

এক জায়গায় স্থির নেই ওগুলো। সারাক্ষণ নড়ছে। আগে-পিছে করছে, উপর-নীচ করছে। তবে ধীর গতিতে।

ওগুলো গোণার চেষ্টা করতে গেল জ্যোতি, কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে হাল ছেড়ে দিতে বাধ্য হলো। সম্ভব নয়। প্রচুর বল। একটা আরেকটার সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি করছে, সবগুলো মিলেমিশে হঠাৎ করে একটা হয়ে যাচ্ছে, পরক্ষণে আবার যা ছিল তার দ্বিগুণ হয়ে যাচ্ছে। তবে জ্যোতির অনুমান, বিশটার কম হবে না।

সবাই দম বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে। বিস্ময়াভিভূত চোখে হাঁ করে তাকিয়ে আছে।

'কী ওসব?' কোনমতে বলল ঊর্মি। 'এমন আজব জিনিস তো জীবনে কখনও দেখিনি!'

'অথচ এতদিন ভাব করেছিস তোর অদেখা কিছু পৃথিবীতে নেই বুঝি,' জ্যোতি বাঁকা মন্তব্য করল। 'চালাকের দাদী, ধরা পড়ে গেছিস।'

'ওগুলো কোত্থেকে এলো কেউ দেখেছিস তোরা?' রাজা প্রশ্ন করল।

'না!' সৌরভ বলল দৃঢ় কণ্ঠে। 'আমি ওদিকেই তাকিয়ে

ছিলাম এতক্ষণ। কসম করে বলতে পারি, কয়েক সেকেন্ড আগেও ছিল না ওগুলো।'

'জিনিসগুলো কী?' ইমরান বলল বিড়বিড় করে। 'কোত্থেকে এসে জুটল?'

'মনে হয় ওগুলোকে চিনতে পেরেছি আমি,' জ্যোতি বলল চিন্তিত গলায়।

সব ক'টা মুখ ঘুরে গেল ওর দিকে। 'কী ওসব?' তিয়ানা প্রশ্ন করল।

'বল লাইটনিং, খুব সম্ভব।'

'কী?'

'বল লাইটনিং,' মাথা ঝাঁকাল জ্যোতি। 'এক ধরনের বজ্র। ঝড়-বৃষ্টির সময় আকাশে সাপের মত আঁকাবাঁকা বিদ্যুৎ চমকাতে দেখা যায় না, যা থেকে বজ্রপাত ঘটে?-ওগুলোও তাই। সাগরে ঝড়ের উৎপত্তি হলে এসব লাইটনিং বলের সৃষ্টি হয়। অবশ্য এগুলো থেকে বজ্রপাত ঘটে না।'

ঊর্মির চেহারায় সন্দেহ ফুটল। 'কিন্তু ঝড়...' চট করে আকাশে চোখ বুলিয়ে নিল। 'কোথায় ঝড়? খানিকটা মেঘ করেছে মাত্র। তা-ও তেমন সিরিয়াস কিছু না। তা হলে কক্সবাজারের ঝড়-সতর্কীকরণ কেন্দ্রে হুলস্থূল কাণ্ড বেধে যেত না? সমস্ত সাইরেন বেজে উঠত না?'

'তা ঠিক,' স্বীকার না করে পারল না জ্যোতি। খানিক চিন্তা করে আবার বলল, 'তা হলে ওগুলো সোয়াম্প গ্যাস বল ছাড়া আর কিছু না। সেগুলোও এইরকম জ্বল-জ্বল করে।'

'কিন্তু এখানে জলাভূমিই বা কোথায়?' ঊর্মি তর্ক জুড়ে দিল। 'লেক আবার জলাভূমি হয় কীভাবে?'

জ্যোতিকে অধৈর্য হয়ে উঠতে দেখা গেল। 'দেখ, ম্যালা ফ্যাচ-ফ্যাচ করিস না তো! আমি একটা যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দাঁড় করাবার চেষ্টা করছি, আর তুই শুধু কাজের মধ্যে বাঁ হাত ঢোকাচ্ছিস!'

'তবে ওগুলোকে ভয় পাওয়ার কিছু আছে বলে মনে হয় না,' তিয়ানা মন্তব্য করল। 'কী অদ্ভুত সুন্দর লাগছে না!'

সবাই একভাবে তাকিয়ে আছে সেদিকে। বলগুলো একটু আগে নড়াচড়া করলেও এ মুহূর্তে এক জায়গায় স্থির হয়ে আছে। গাছের আড়াল থেকে খোলা জায়গায় আসছে না। দেখলে মনে হবে কিছু একটা ঘটার প্রতীক্ষায় আছে।

একটু পর ঊর্মিকে দীর্ঘশ্বাস ছাড়তে শুনে সচকিত হলো সবাই।

'তিয়ানা,' মৃদু গলায় ডাকল ও। 'না বুঝে বিখ্যাতদের মত মুখস্থ উক্তি করে বসিস না। যা কিছু অদ্ভুত, তার মধ্যেই বিপদ লুকিয়ে থাকার শঙ্কা বেশি থাকে। আমার মনে হয় এখনই এখান থেকে পালিয়ে যাওয়া উচিত আমাদের।'

বলতে বলতে টিরার উপর চোখ পড়ল ওর। অদ্ভুত দৃষ্টিতে বলগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে মেয়েটা। দুনিয়ার কোনদিকে খেয়াল নেই। সামান্য কাত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অতল সাগরের মত নীল চোখে অদ্ভুত এক আলো জ্বল-জ্বল করছে।

বিস্ময় হজম করে ওর দিকে এগিয়ে গেল ঊর্মি। 'তুমি আগে

কখনও দেখেছ এসব?'

উপরে-নীচে মাথা দোলাল টিরা। 'একবার দেখেছিলাম। অনেক আগে।'

অবাক হয়ে ওর দিকে এগিয়ে গেল রাজা। 'তুমি জানো ওগুলো কী?'

ডানে-বাঁয়ে মাথা নাড়ল মেয়েটা। নজর নামিয়ে নিল। 'না। তা জানি না।'

'কোথায় দেখেছিলে ওগুলোকে?' ঊর্মির গলায় সন্দেহ ফুটল।

টিরা একভাবে তাকিয়ে থাকল ওর দিকে। 'ওখানেই। এখন যেখানে আছে।'

'ওগুলোর জন্যই কি তুমি এখানে আসতে চেয়েছিলে?' ধীরে ধীরে বলল জ্যোতি। 'তুমি জানতে বলগুলো আজ আবার দেখা দেবে?'

'না, তা জানতাম না।'

'ওগুলো বিপজ্জনক কি না, সেটা তো অন্তত বলতে পারো!' সৌরভ বলল।

'আমার মনে হয় না ওগুলোকে ভয় পাওয়ার কিছু আছে,' দেহের ভর এক পা থেকে অন্য পায়ে চাপাল মেয়েটি। 'এমন কিছু কখনও শুনিনি।'

'বলগুলো শেষবার দেখা দেয়ার সময় কিছু ঘটেছিল?' ঊর্মি জানতে চাইল।

'কিছু না,' এক কথায় জবাব দিল টিরা।

'আমার মনে হয় ব্যাপারটা চেক করে দেখা দরকার,' রাজা

বলল চিন্তিত গলায়। বাবল গাম চিবানো বন্ধ রেখেছে আপাতত। 'অন্তত নতুন একটা কিছু সম্পর্কে জানা তো যাবে!'

'ভাল কথা,' সৌরভ ছোট একটা ঝোপের পাশে বসে পড়ল। 'তোর জ্ঞান যখন এতই সীমিত, তখন তুই একাই যা। আমি ওসবের মধ্যে নেই।'

'আমরা যা করি দল বেঁধে কার,' ঊর্মি বলল তীক্ষ্ণ গলায়। 'একা কিছু করি না। যেতে যদি হয়, সবাই মিলে যাব। নইলে কেউ যাবে না।'

'ঠিক বলেছিস,' পা ঠুকল জ্যোতি। 'কিন্তু এই কাজে সবার গিয়ে কাজ নেই। আমি যাচ্ছি রাজার সঙ্গে।'

'বাহ্, কী বাহাদুর!' তিয়ানা টিটকারির সুরে বলল। 'জ্যোতি ভাবে সমস্ত ঝুঁকি বুঝি ছেলেরাই নিতে পারে। মেয়েরা সেসব পারে না, কেমন?'

'আহ্, থাম!' চাপা ধমক লাগাল ঊর্মি। 'ও আমাদেরকে ঝামেলায় জড়াতে চাইছে না। কিন্তু তাই বলে আমি ভুলছি না। আমি যাব। চাইলে তুইও আয়।'

রাজার কোনদিকে খেয়াল নেই। টিরার দিকে ফিরল ও। 'তুমি কাছে থেকে দেখতে চাও ওগুলোকে? যাবে আমাদের সঙ্গে?'

বলগুলোর উপর থেকে চোখ সরছে না তার। সম্মোহিতের মত একভাবে তাকিয়ে আছে। রাজার প্রশ্নের জবাবে আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল। 'না।'

চার

খুদে গোয়েন্দাদের দলটাকে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসতে দেখেও কোন প্রতিক্রিয়া হলো না বলগুলোর মধ্যে–অন্তত চোখে পড়ার মত প্রতিক্রিয়া হলো না।

এক গজ, দু'গজ করে এগিয়ে গেল ওরা। অদ্ভুত বলগুলোর কয়েক গজের মধ্যে পৌছে মুখ তুলে তাকিয়ে থাকল। ইচ্ছে হলে আরও এগিয়ে যেতে পারে, কিন্তু গেল না।

মুখ তুলে চেয়ে থাকতে থাকতে ঘাড় ব্যথা হয়ে গেল সবার। টন-টন করতে লাগল ঘাড়ের পেশি।

'আমি ভাবছি, বলগুলো কি জানে আমরা এখানে দাঁড়িয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে আছি?' ফিস-ফিস করে অনেকটা যেন নিজেকেই প্রশ্ন করল রাজা।

অবাক হয়ে গেল তিয়ানা। 'তার মানে? তুই কি ভাবিস ওগুলোর সেসব বোঝার ক্ষমতা আছে?' মাথা নাড়ল। 'আমার তা মনে হয় না। ওগুলোর সে-বোধ আসবে কোত্থেকে?'

'আমার মনে হয় ওগুলো...'

'খুব সম্ভব বোঝার ক্ষমতা আছে ওগুলোর,' কথার মাঝে উর্মিকে বাধা দিল জ্যোতি। 'এমনও হতে পারে বুদ্ধিও আছে।

হয়তো আর কোন গ্রহ থেকে এসেছে ওরা।'

'আমার মনে হয় বোধশক্তি নেই,' রাজা বলল। 'আমাদের মত দেখাশোনার জন্য চোখ-কান নেই। কী বলিস, ঊর্মি আপু! হতে পারে না?'

'তা পারে,' মাথা ঝাঁকাল ও। চিন্তিত। 'বাইরে থেকে দেখে মনে হচ্ছে না ওদের কোনরকম বোধশক্তি আছে। কিন্তু আমার কেন যেন মনে হচ্ছে আছে।'

'কেন এরকম মনে হলো তোর?' চট করে ঘুরে তাকাল জ্যোতি। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। 'কী দেখে ভাবলি...?'

'আমাদেরকে কাছে এসে দাঁড়াতে দেখে ওর মধ্যে দুটোর উজ্জ্বলতা কিছুটা বেড়েছে।'

দ্রুত মুখ তুলে তাকাল জ্যোতি। 'কোন দুটোর?'

'আমিও খেয়াল করেছি,' সৌরভ বলল। 'ওই দুটোর। ওই যে, সেগুন গাছটার খুব কাছের দুটোর। আমাদেরকে আসতে দেখে ওগুলোর আলো বেড়ে গেছে। এমনকী একটু এগিয়েও এসেছে।'

'আমাদের দিকে?' ঊর্মি জানতে চাইল।

সৌরভ মাথা দোলাল। 'হ্যাঁ। খুব সামান্য অবশ্য,' বলে টিরার দিকে ফিরল। 'তুমি শেষবার যখন দেখেছ, তখনও কি এরকম আচরণই করেছিল ওরা?'

টিরা উদাস চোখে তাকিয়ে থাকল বলগুলোর দিকে। যেন হঠাৎ করে কী এক গভীর চিন্তায় ডুবে গেছে।

ওর জবাবের আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিল সবাই, এমন সময়

নড়ে উঠল মেয়েটা। মৃদু কণ্ঠে বলল, 'হ্যাঁ। সেবারও এরকমই করেছিল।'

'ঢিল মেরে দেখি কী করে?' ইমরান পায়ের কাছে ঢিল খুঁজতে লাগল। 'তা হলে…'

'না, খবরদার! ঢিল মারবি না!' রাজা দৃঢ় গলায় বলল। 'কে জানে, প্রাণ আছে হয়তো ওগুলোর।' তীক্ষ্ণ চোখে পরখ করতে লাগল বলগুলোকে।

সৌরভ বিড়বিড় করে বলল, 'প্রাণ আছে না হাতি আছে।'

'ওই যে ওগুলোর মাঝখানটায় একটু একটু স্পার্ক করছে দেখছিস?' জ্যোতি বলল। 'তাতে মনে হয় কোনরকম বৈদ্যুতিক চার্জ ঘিরে আছে ওদেরকে। হয়তো বজ্রের সঙ্গে কোন সংশ্রব আছে…'

'আবার সেই কথা?' ঊর্মি ধমকে উঠল। 'ঝড়ের খবর নেই, বাজ আসবে কোত্থেকে?'

'এখানে না হয় নেই,' জ্যোতি ধৈর্যের সঙ্গে বোঝাতে চেষ্টা করল। 'কিন্তু গভীর বঙ্গোপসাগরে তো থাকতে পারে! ঝড়ের সৃষ্টি হয়েছে সাগরে। সেখানে সৃষ্টি হওয়া লাইটনিং বল এখানে উড়ে এসেছে। কখন কোথায় কী হয়, সব কি আমরা জানি?'

'আমি জানি!' টিরার দৃঢ় কণ্ঠের জবাব শুনে ঘুরে তাকাল সবাই। পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। 'আমি জানি ওগুলো লাইটনিং বল না।'

'তাহলে কী ওগুলো?' রাজা বলল অভিভূতের মত। টিরার সবচেয়ে কাছে রয়েছে ও।

'অপেক্ষা করো, দেখাচ্ছি,' বলে গম্ভীর মুখে পা বাড়াল মেয়েটা। শূন্যে ভাসমান বলগুলোর দিকে এগিয়ে গেল। মুখ তুলে সবচেয়ে কাছেরটার অবস্থান দেখে নিয়ে সরাসরি সেটার নীচে গিয়ে দাঁড়িয়ে মুখ তুলে তাকাল।

প্রথমে কিছুক্ষণ সময় থমকে থাকল যেন। কিছুই ঘটল না। ধীরে ধীরে দু'হাত মাথার উপরে তুলল টিরা। তারপর প্রসারিত করে ইংরেজি 'ওয়াই' হয়ে দাঁড়াল—যেন ওটাকে সাদরে আলিঙ্গন করতে প্রস্তুত হচ্ছে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নড়ে উঠল বলটা। টিরার দিকে একটু একটু করে নেমে আসতে লাগল। ব্যাপারটা কেন যেন পছন্দ হলো না রাজার। আলোর বলটা টিরাকে স্পর্শ করার আগেই এক লাফে ওর পাশে পৌঁছে গেল ও, ধাক্কা দিয়ে মেয়েটাকে সরিয়ে দিল। নিজেও সরে আসতে চাইছিল, কিন্তু দেরি হয়ে গেছে তখন।

টিরার বদলে ওকেই ছুঁয়ে ফেলল রহস্যময় বলটা। পরমুহূর্তে ভয়ঙ্কর একটা ব্যাপার ঘটে গেল।

হঠাৎ রাজাকে ঘিরে এমনভাবে উজ্জ্বল সাদা আলো ঝলসে উঠল যে কয়েক মুহূর্তের জন্য মনে হলো রাজার দেহটা বোধহয় আলোরই তৈরি। ওর ভিতর দিয়ে ওপাশের দৃশ্য স্পষ্ট দেখতে পেল সবাই।

রাজার প্রতিটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, পেশি, ভিতরের হাড়ের কাঠামো, শিরায় শিরায় রক্তের চলাচল, সবকিছু মুহূর্তের জন্য আলোকিত হয়ে উঠল—যেন রাজার সর্বাঙ্গের এক্স-রে করা হলো এবং ফিল্ম ছাড়াই তা প্রদর্শন করা হলো।

ব্যাপারটা কতক্ষণ ধরে ঘটল, স্পষ্ট করে বলতে পারবে না কেউ। হয়তো কয়েক সেকেন্ডের জন্য হবে। তবে বলটা শুধু রাজাকে ছুঁয়েই গেল না, বরং মনে হলো ওর ভিতরে ঢুকে গেল।

ওদিকে সৌরভ সবার চোখ এড়িয়ে একটা মাটির ঢেলা তুলে নিয়েছিল ওটাকে মারবে বলে, কিন্তু পরমুহূর্তে বলটা হাওয়া হয়ে যেতে থমকে গেল ও।

রাজা মনে হলো জায়গায় জমে গেছে। টিরাকে ধাক্কা দেওয়ার সময় যে অবস্থানে ছিল, এখনও ঠিক সেই ভঙ্গিতে সেই অবস্থানেই আছে। ওদিকে ওর ভিতরে ঢুকে পড়া আলোর তেজ ক্রমে বাড়ছে দেখে টিরাও স্থির। একভাবে তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

আলো বাড়ছে। প্রথম দেখা দেওয়ার সময় বলগুলো যে পরিমাণ আলো ছড়াচ্ছিল, তার চেয়ে একশো গুণেরও বেশি বেড়ে গেল আলোর উজ্জ্বলতা। আলোর ঝলকানিতে অন্ধ হয়ে যাওয়ার অবস্থা। সবাই বাধ্য হয়ে দু'হাতে চোখ চেপে ধরে রাখল। কিন্তু টিরার কোন প্রতিক্রিয়া নেই।

সবকিছু এত দ্রুতগতিতে ঘটছে, এত অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে যে রাজাকে সাহায্য করার চিন্তা করার সুযোগই পেল না কেউ। সেটাও কয়েক মুহূর্তের জন্য।

তারপর আচমকা আলো গায়েব হয়ে গেল। রাজা জ্ঞান হারিয়ে আছড়ে পড়ল মাটিতে। সবাই ছুটে গেল রাজার দিকে।

গেল না কেবল টিরা।

'রাজা!' চিৎকার করে উঠল জ্যোতি। ছুটে গিয়ে হাঁটু গেড়ে

বসল ওর পাশে, টানাটানি করে চিত করে শোয়াল বন্ধুকে।

'সব্বোনাশ!' উপম বলল বিড়বিড় করে।

সেকেন্ডের জন্য চোখ মেলল রাজা। আকাশের দিকে তাকিয়ে শূন্য দৃষ্টিতে কিছু খুঁজল হয়তো, তারপর জোরে জোরে কাশল কিছুক্ষণ। বিড়বিড় করে কী সব বলতে লাগল। একটা অক্ষরও বুঝতে পারল না কেউ।

তবে জ্যোতির মনে হলো, প্রথম শব্দটা যতদূর সম্ভব 'না,' ছিল।

ঝুঁকে ওর নাড়ির গতি পরীক্ষা করতে গিয়ে চমকে উঠল। 'বাপরে! ওর হার্ট যে ঘোড়ার মত টগবগিয়ে ছুটছে।'

'আমারও তো!' ঊর্মি বলল। মাথা দোলাল রাজার দিকে তাকিয়ে।

'তবু ভাগ্য ভাল যে এখনও বেঁচে আছে,' তিয়ানা বলল। 'ওকে তুলে বসা।'

'না!' মাথা নাড়ল ঊর্মি। 'ব্যাপারটা বৈদ্যুতিক শকও হতে পারে। সে ক্ষেত্রে ওকে নাড়াচাড়া করতে গেলে উল্টে বিপদ হবে। এখন যথাসম্ভব গরম রাখতে হবে ওকে।'

'ডাক্তার দরকার!' ইমরান ফুঁপিয়ে উঠল। 'ডাক্তার…না, না! হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে ওকে। এখনই…!'

'কিন্তু…' অসহায়ের মত এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল জ্যোতি। 'এইখানে সেসব পাব কোথায়! লোকালয় থেকে এত দূরের নির্জন এক জায়গায়…'

'কিন্তু আমি শুনেছি এখানকার হাসপাতালে রোগী যাতে না

বাঁচে, সেই চেষ্টাই বেশি করা হয়,' তিয়ানা বলল।

'সে কী! কে বলল এমন কথা!' জ্যোতি চোখ কুঁচকে তাকাল।

'অঞ্জন,' তিয়ানা বলল। 'সরোয়ার আঙ্কেলদের পাশের বাসার ছেলেটা।'

'কী বলেছে?'

'গত বছর লিটু নামে ওর এক বন্ধুকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। টনসিল অপারেশন করানোর জন্য। সেখান থেকে নাকি ছেলেটার একটা কিডনি আর লিভার কেটে নিয়ে কালোবাজারে বেচে দেওয়া হয়েছিল।'

'কী!' বিশ্বাস হলো না সৌরভের। 'কিডনি আর লিভার ছাড়া মানুষ বাঁচে কখনও?'

ভাল মানুষের মত মাথা নাড়ল তিয়ানা। 'আমি কি বলেছি লিটু বেঁচে আছে? এখন রাজার ব্যাপারে যা করা দরকার, আমাদেরকেই করতে হবে। আমরা কোন ঝুঁকি নেব না।'

ঊর্মি ঝুঁকে বসে রাজার চোখ পরীক্ষা করতে লাগল। মুহূর্তের জন্য মনে হলো ও দুটো জ্বলে উঠল বুঝি। পরক্ষণে স্তিমিত হয়ে এল আবার। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল।

'রাজা?' ডাকল ও। 'আমার কথা শুনতে পাচ্ছিস?'

ঠোঁট নাড়ল রাজা, কিন্তু গলা দিয়ে কোন শব্দ বের হলো না।

'চোখেমুখে পানির ছিটা দিতে পারলে উপকার হবে,' ঊর্মি বলল। 'পানির ব্যবস্থা কর।'

'কিন্তু এই লেকের পানি ব্যবহার করা কি ঠিক হবে?' তিয়ানা বলল। 'এটার পানি নাকি সুবিধার না? যদি কোন ক্ষতি হয়ে যায়

ওর?'

'দূর, কিছু হবে না,' উপম বলল। 'আমি প্রথমদিন এটার পানি দিয়ে মুখ ধুয়েছিলাম। কই, কী হয়েছে তাতে?'

পানি নিয়ে আসার মত কিছু না পেয়ে গায়ের সমস্ত কাপড় খুলে ফেলল ও, গেঞ্জিটা খুলে নিয়ে আবার সব পরল। তারপর লেকের পানিতে গেঞ্জি ভিজিয়ে দৌড়ে এসে পানিটুকু রাজার মুখের ওপর চিপড়াল। কিন্তু তাতে কোন উপকার হয়েছে বলে মনে হলো না।

রাজা আগের মতই ফ্যালফ্যাল করে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। শ্বাস-প্রশ্বাস কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে, হৃৎপিণ্ডের গতিও আগের চেয়ে অনেক কম। কিন্তু দৃষ্টি এখনও আগের মতই শূন্য। কিছু দেখছে বলে মনে হয় না। ভেজা গেঞ্জি দিয়ে ওর চোখমুখ ভাল করে ডলে ডলে মুছে দিল উপম।

জ্যোতি টিরার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। চিন্তায় কপাল কুঁচকে আছে। 'টিরা, আলোর বলগুলো আগে কখনও এরকম করেছে?'

'ওগুলো চলে গেছে,' মৃদু গলায় বলল মেয়েটা। জ্যোতির মনে হলো ওর দু'চোখে চাপা উল্লাস খেলা করছে।

অবাক হয়ে মুখ তুলল ওরা। হ্যাঁ, তাই। একটা বলও নেই আগের জায়গায়।

'তাই তো!' ঊর্মি উত্তেজিত হয়ে উঠল। 'কোথায় গেল ওগুলো?'

'এসেছিলই বা কোত্থেকে?' জ্যোতির কণ্ঠে পরিষ্কার বিরক্তি। 'টিরা, তুমি কিন্তু এখনও আমার প্রশ্নের উত্তর দাওনি। বলগুলো

আগে কখনও আক্রমণ করেছে কাউকে?'

'আমি ঠিক জানি না,' দ্বিধাগ্রস্তের মত বলল ও।

'তুমি জানো না মানে কী?' ঊর্মি বলল। 'আক্রমণ করেছিল কি করেনি? রাজার অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছ! এখন ওকে নিয়ে কী করতে হবে আমরা জানি না। সম্ভব হলে তুমি এ ব্যাপারে সাহায্য করো আমাদেরকে।'

জবাব না দিয়ে রাজার দিকে তাকাল মেয়েটা। চাপা গলায় বলল, 'আমি কীভাবে সাহায্য করব বুঝতে পারছি না। তবে এটুকু বলতে পারি তোমাদের দুশ্চিন্তার কিছু নেই। আমার ধারণা আর কিছুক্ষণের মধ্যেই রাজা সুস্থ হয়ে উঠবে।'

'মনে হয় না,' মাথা নাড়ল ইমরান।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত টিরার কথাই সত্যি হলো দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল সবাই।

কয়েক মিনিটের মধ্যে নড়াচড়া শুরু করল রাজা। পিট-পিট করে নিজের চারদিকে তাকাতে লাগল। চেহারার রং ফিরে আসতে লাগল একটু একটু করে। একটু পর চাউনি স্বাভাবিক হয়ে আসতে মুখের উপর ঝুঁকে থাকা উদ্বিগ্ন বন্ধুদের সবার উপর একে একে চোখ বোলাল।

'কী হয়েছিল?' কোনমতে জানতে চাইল ও।

'কেন, তোর কিছু মনে পড়ছে না?' জ্যোতি পাল্টা প্রশ্ন করল।

ওকে উঠে বসার জন্য ধস্তাধস্তি করতে দেখে সাহায্য করল ও। মনে হলো রাজা কিছুটা আড়ষ্ট হয়ে গেছে।

'কীসের কথা বলছিস?' ক্ষীণ কণ্ঠে বলল রাজা। 'কী মনে

পড়বে?'

'আলোর বলগুলোর একটা তোকে প্রায় গিলে ফেলেছিল, মনে নেই?' ঊর্মি বলল। 'তোর সারা গা মশালের মত জ্বলে উঠেছিল। বাইরে থেকে তোর প্রতিটা হাড়গোড় একদম স্পষ্ট দেখতে পেয়েছি আমরা। এ মা! যা বিচ্ছিরি দেখাচ্ছিল না তোকে!' গলা টানার ভঙ্গি করল ও।

চোখ পিট-পিট করে উঠল রাজার। 'ঠাট্টা করছিস?'

জ্যোতি পাশে বসে ওর কাঁধে একটা হাত রাখল। নরম গলায় বলল, 'ঠাট্টা না, রাজা। সত্যি।' একটু পর আবার বলল, 'ভুলে গেলি ওগুলোর কথা?'

রাজা চিন্তিত চেহারায় এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। প্রথমে গাছগুলোর উপর নজর স্থির হলো ওর, তারপর লেকের উপর দিয়ে ঘুরে এল।

'হ্যাঁ। মনে পড়েছে। একটা বল টিরার দিকে আসছিল, আমি ওকে সরিয়ে নিতে চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু...' থেমে মাথা চুলকাল রাজা। আকাশের দিকে তাকাল। 'কোথায় গেল বলগুলো?'

'আমরা জানি না,' হাত ধরে রাজাকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল জ্যোতি। 'একটা বল তোর মধ্যে ঢুকে পড়ার পর বাকিগুলো হঠাৎ উধাও হয়ে গেছে।'

জ্যোতি তাকিয়ে থাকল বন্ধুর দিকে।

'আমার মধ্যে ঢুকে গেছে!' অবিশ্বাসে বিস্ফারিত হয়ে উঠল রাজার চোখ। 'দূর, মিথ্যে বলছিস!'

'কিন্তু এই না তুই বললি, কী ঘটেছে তুই জানিস না?' তিয়ানা

বলল। 'তা হলে বুঝলি কী করে জ্যোতি মিথ্যে কথা বলছে?'

কিন্তু রাজা হার স্বীকার করতে রাজি নয়। দৃঢ় ভঙ্গিতে বলল, 'আমি জানি বলগুলো আর নেই। চলে গেছে। আমিও ঠিক আছি। এখন চল, সন্ধ্যা হয়ে আসছে।'

কারও অপেক্ষা না করে ঘুরে দাঁড়াল রাজা। একাই হাঁটতে শুরু করল শহরের দিকে। কয়েক পা গিয়ে গলা চড়িয়ে বলল, 'আজ এখানে কী ঘটেছে, ভুলে যা সবাই।'

কথাটা কেন বলল রাজা? ভাবল জ্যোতি। এ কথার অর্থ কী?

উর্মি, তিয়ানা, উপম, সৌরভ আর ইমরানও ভাবল কথাটা।

ভাবল না কেবল রাজা।

ও আর কিছু ভাবছে। টিরাকে পাশে নিয়ে আগে আগে হেঁটে চলেছে ও।

এতক্ষণে আবহাওয়ার কথা মনে পড়ল জ্যোতির। আকাশের দিকে তাকাল। আরও ঘন হয়ে এসেছে মেঘ। এমনভাবে হুড়মুড় করে ছুটছে যেন কোথায় কী এক জরুরি কাজ পড়ে আছে। তাড়াতাড়ি না পৌঁছলেই নয়।

বাতাসের গতিও আগের তুলনায় কিছুটা বেড়েছে। রাতে ঝড় হবে নাকি? ভাবল ও। কিন্তু বছরের এই সময় তো সাধারণত ঝড় হয় না!

পাঁচ

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতেই মনটা খুশি হয়ে উঠল জ্যোতির। বাইরে রোদ ঝলমল করছে। অর্থাৎ আগের দিন মেঘের চেহারায় যে প্রলয় সঙ্কেত ছিল, বাস্তবে তার কোন প্রকাশ ঘটেনি।

অবশ্য আগুনের বলগুলোর কথা খেয়াল হতে সমস্ত স্বস্তি ওর মুহূর্তে উবে গেল।

তাড়াতাড়ি বিছানার উপর উঠে বসল জ্যোতি। পাশের বিছানাটা রাজার। ও এখনও বিছানাতেই আছে। ঘুমে বিভোর। কিছুক্ষণ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল জ্যোতি।

একদম স্বাভাবিক। ওকে ডাক দিতে গিয়েও শেষ সময়ে নিজেকে সামলে নিল জ্যোতি। ডাকল না। ভাবল, ঘুমিয়ে নিক আরেকটু। কাল অনেক বড় ধকল গেছে ওর উপর দিয়ে। যত খুশি ঘুমাক। ঘুম পুরলে নিজেই উঠে পড়বে।

কাপড়চোপড় পরে বাইরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে নিল জ্যোতি। উর্মি, তিয়ানা, সৌরভ আর ইমরান নেই। ওরা যথারীতি ওদের নির্ধারিত ফার্স্ট ফ্লাইট ধরতে চলে গেছে আঙ্কেলের সঙ্গে। ছয়টা থেকে আটটা পর্যন্ত ওদের পালা।

হাত-মুখ ধুয়ে উপমকে নিয়ে ডাইনিং রুমে চলে এল। গরম

গরম পরাটা আর কয়েক পদের ভাজি, গরুর ভুনা মাংস দিয়ে পেট পুরে নাস্তা খেল ওরা। তারপর আন্টি, মিসেস হোসেনের সঙ্গে গল্প করতে বসল।

মহিলা একেবারে সহজ-সরল মানুষ। ষোলো আনা গৃহিণী। নিজের সন্তান নেই, তাই অন্যের ছেলেমেয়ে সামলাবার দায়িত্ব পেয়ে গত কয়েকদিন ধরে রীতিমত বাড়াবাড়িই শুরু করে দিয়েছেন। খাওয়ার নামে ভীষণ অত্যাচার চালাচ্ছেন ওদের উপর। হরর ক্লাবের সদস্যদের কাছে এখন তিনিই সবচেয়ে বড় হরর।

তবে এই আদরের হররকে জ্যোতিরা খুশি মনেই মেনে নিয়েছে। বিশেষ করে পেটুক উপম তো মহাখুশি।

'রাজা কোথায়?' গল্প করতে করতে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন তিনি। 'ও এল না যে!'

'ও এখনও ঘুমাচ্ছে, আন্টি,' খানিক ইতস্তত করে বলল জ্যোতি।

'এখনও ঘুমাচ্ছে? শরীর খারাপ নাকি?'

'না, না!' উপম বলল। টেবিলের ফ্রুট বাস্কেটে সাজিয়ে রাখা আঙুরের থোকা থেকে একটা একটা করে আঙুর ছিঁড়ছে আর টপাটপ মুখ পুরছে। 'শরীর খারাপ না, আন্টি। এমনিই। ও বাসায়ও দেরি করে ওঠে।'

'কিন্তু এতদিন তো তোমাদের সঙ্গেই নাস্তা করেছে ও!' বললেন মিসেস হোসেন। 'তোমরা বোসো। আমি দেখে আসি!'

একটু পরই ফিরে এলেন তিনি। চিন্তিত। 'কোথায় ঘুমাচ্ছে!

রাজা তো নেই!'

'নেই!' অবাক হলো জ্যোতি। 'নেই মানে? কোথায় গেল?'

মাথা নাড়লেন মহিলা। 'তা জানি না। রুমে নেই ও।'

'আচ্ছা, আমরা দেখছি।'

সত্যি নেই, রুমে এসে দেখল ওরা গায়েব হয়ে গেছে রাজা। একটু আগে যে ট্র্যাক ট্রাউজার্স পরে ঘুমাচ্ছিল, সেটা খাটের মাথার দিকের বাজুতে ভাঁজ করে রাখা। তার পাশে যে জিনস ছিল, সেটা নেই। অর্থাৎ এর মধ্যে পোশাক পাল্টে ফেলেছে ও। খাটের পায়ের কাছে যে দামী অ্যাঙ্কেল বুট জোড়া ছিল, তা-ও নেই।

ব্যাপার কী? গেল কোথায় রাজা?

'কী হলো, পেলে রাজাকে?' জানতে চাইলেন গৃহকর্ত্রী।

'না, আন্টি,' উপম বলল। 'মনে হয়...আচ্ছা, আপনি ভাববেন না। আমরা দেখছি। আয়, জ্যোতি!'

শেষ ভরসাস্থল হিসাবে বাথরুমে এক নজর চোখ বুলিয়ে নিল। সেখানেও নেই। বাইরে এসে বোকার মত এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল ওরা।

'এটা কেমন কথা হলো!' আপন মনে বলে উঠল বিস্মিত জ্যোতি। 'যেতে হয় যাবি। কিন্তু আন্টি বেচারী নাস্তা বানিয়ে বসে আছেন, খেয়ে যাবি তো!'

'তাছাড়া একা একা যাবেই বা কোথায়!' উপম বলল। 'এমন যদি...' জ্যোতি হঠাৎ খপ করে ওর বাহু চেপে ধরতে ব্যথায় লাফিয়ে উঠল। 'অ্যাই, অ্যাই! করিস কী? কী...'

বলতে বলতে ওর মুখের দিকে তাকিয়েই জমে গেল উপম। জ্যোতির চোখ কোটর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ার দশা হয়েছে। 'কী হয়েছে?'

'রাজা লেকের কাছে যায়নি তো?' ফিস-ফিস করে অনেকটা যেন নিজেকে প্রশ্ন করল ও। 'কালকের সেই আলোর বলটা ওকে সম্মোহন করে ফেলেনি তো!'

'তা কেন করবে?'

'আমি তার কী জানি!' চাপা গলায় ধমক লাগাল জ্যোতি। 'করতে পারে না?'

অনেকক্ষণ ধরে কিছু ভাবল উপম। তারপর মাথা দোলাল। 'তা পারে। হয়তো তাই ঘটেছে। সম্মোহিত হয়ে পড়েছে রাজা। তাহলে তো ঘটনায় সিরিয়াস প্যাঁচ খেয়ে গেছে। কিন্তু…!'

'রাজা মুখে যা-ই বলুক না কেন, কালকের অদ্ভুত বলটা ওকে বড় ধরনের এক ঝাঁকি দিয়ে গেছে। ফেরার সময় একটা ব্যাপার খেয়াল করেছিলি? সারা পথে দশটা কথাও বলেনি ও?'

'শুধু ঝাঁকি না,' জোরে জোরে মাথা নাড়ল উপম। 'আমার মনে হয় তারচেয়েও বেশি কিছু দিয়ে গেছে। বল লাইটনিঙের চেয়েও বেশি ক্ষমতাবান ছিল ওটা, সম্ভবত।'

'তা ছাড়া রাজাকে আক্রমণ করার পরপরই সবগুলো বল একযোগে উধাও হয়ে গেল, সেটাও কম চিন্তার ব্যাপার না,' জ্যোতি বলল।

ভুরু কুঁচকে উঠল উপমের। রাস্তায় পড়ে থাকা একটা ছোট পাথরকে লাথি মেরে দূরে পাঠিয়ে দিয়ে জ্যোতির দিকে ফিরল।

'যদি ওটা রাজাকে আক্রমণ করে থাকে, তা হলে বুঝতে হবে জিনিসটা শুধুই আলোর বল হতে পারে না। আর কিছু।'

'আমারও তাই মনে হয়। তার নমুনা টিরা দেখিয়েছে কিছুটা। মনে নেই, বলগুলোকে কীভাবে হাত বাড়িয়ে আলিঙ্গন করতে চেয়েছিল মেয়েটা?'

'ঠিক,' মাথা ঝাঁকাল উপম। 'মনে হয়েছে, বলগুলোকে ডাকছিল ও।'

'কিন্তু এখন কী করি? কোথায় খুঁজতে যাব রাজাকে?' জ্যোতি বলল। একটু থেমে আরও কিছু বলার জন্য মুখ খুলতে যাচ্ছিল ও, এমন সময় ঊর্মি, তিয়ানা, ইমরান ও সৌরভের সম্মিলিত হই-হই শুনে ঘুরে তাকাল।

'কী ব্যাপার?' উপম গলা চড়িয়ে প্রশ্ন করল। 'তোরা ফিরে এলি কেন?'

'আর বলিস না,' তিয়ানা বলল হতাশ কণ্ঠে। 'আজ ওড়া যাবে না।'

জ্যোতি বলল, 'কেন ওড়া যাবে না?'

'বেলুনে কী যেন সমস্যা হয়েছে,' ঊর্মি বলল। 'ব্যাড লাক। অবশ্য আঙ্কেল সমস্যা দূর করার চেষ্টা করছেন। কাজ হলে পরে চড়া যাবে।'

'কিন্তু এদিকে একটা সমস্যা হয়ে গেছে।'

'সমস্যা? কী সমস্যা?' কপাল কুঁচকে উঠল ঊর্মির। সঙ্গে সঙ্গে সিরিয়াস হয়ে উঠল। জ্যোতির মুখে পুরো ঘটনার বর্ণনা মন দিয়ে শুনে অনেকক্ষণ ধরে কিছু ভাবল।

'লেকের কাছে চল তাহলে। এখনই যাওয়া দরকার।'

'ওখানে গিয়ে কী লাভ?' ইমরান বলল। 'আমার এখন অতদূর যেতে ইচ্ছে করছে না।'

'এ কী বলছিস!' চাপা ধমক লাগাল ঊর্মি। 'আমাদের এক বন্ধুকে পাওয়া যাচ্ছে না। মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে আমাদের সবার চোখের সামনে তার ওপর দিয়ে বড় একটা বিপদ গেছে, ভুলে গেলি? আবার কোন নতুন বিপদে পড়ে থাকতে পারে সে। আমরা না গেলে কে সাহায্য করবে ওকে?'

'তুই শিওর ও কোন বিপদে পড়েছে?' তিয়ানা বলল। চোখে রোদ পড়ায় গাল কুঁচকে এক হাতে আলো আড়াল করে রেখেছে।

মাথা নাড়ল ও। 'না, শিওর না। কিন্তু পড়ে থাকতে পারে। টিরা কাল বিপদ হতে পারে জেনেই আমাদেরকে লেকের কাছে নিয়ে গিয়েছিল। ওর কথাবার্তা আর আচরণ দেখে মনে হয়েছে বলগুলো সম্পর্কে ভালই জ্ঞান রাখে, অথচ বারবার জিজ্ঞেস করার পরও আমাদেরকে কিছু বলল না। আজ আবার কোন্ কাণ্ড ঘটাবে, তার ঠিক কী?'

'হ্যাঁ,' তিয়ানা মাথা দোলাল। 'টিরা কীভাবে যেন জানত রাজা শকের ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে পারবে। আসার পথে আমি বারবার জানতে চেয়েছি ও তা জানল কীভাবে। কিন্তু মেয়েটা কোন জবাবই দেয়নি।' আবার মাথা নাড়ল ও। 'ওকে বিশ্বাস নেই।'

'আরে, আরে!' সৌরভ বলল। 'তোরা দেখছি মেয়েটাকে পুরোপুরি ভিলেন বানিয়ে ফেলেছিস! কেন বল তো! আমাদের কিছু প্রশ্নের জবাব দিতে পারেনি বলে?'

মাথা নাড়ল ঊর্মি। 'উহুঁ! মেয়েটা রহস্যময় বলে। জানা থাকতেও সত্যি কথাটা আমাদের কাছে চেপে গেছে বলে। ও থাকে কোথায়, ওর বাবা কী করেন, বলগুলোকে আগে কীভাবে দেখেছে, সব চেপে গেছে আমাদের কাছে। কেন? কারণ এর মধ্যে ওর মতে লুকিয়ে রাখার মত কিছু আছে। তাই ওকে বিশ্বাস করা যায় না।'

'হতে পারে আমাদের সঙ্গে নতুন পরিচয় হয়েছে বলে সব প্রশ্নের জবাব দেয়নি মেয়েটা,' সৌরভ যুক্তি দাঁড় করানোর চেষ্টা করল। 'তাছাড়া সব কথা আমাদেরকে বলতে হবেই বা কেন? আমরা কি আমাদের সব কথা ওকে বলেছি? টিরা যেমন আমাদের কাছে নতুন, তেমনি আমরাও তো ওর কাছে নতুন। ওর জায়গায় আমি হলেও হয়তো এই আচরণই করতাম।'

টিরা সম্পর্কে সৌরভের যুক্তিগুলো একেবারে উড়িয়ে দেওয়ার নয়। তবু ঊর্মি বলল, 'আমার টিরাকে সন্দেহ করার আরও কারণ আছে। প্রথমটা হলো, কাল ভয় পাওয়ার মত কিছু একটা ঘটেছে রাজার ভাগ্যে। সেটা টিরার প্রত্যক্ষ দোষে না পরোক্ষ দোষে সে ব্যাপারে আমরা এখনও নিশ্চিত নই। তার সঙ্গে রাজার উধাও হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটাও আছে। এর সঙ্গে টিরার হাত আছে কি না, আমরা তা-ও জানি না। তাই ওকে সন্দেহ করলে অন্যায় করা হবে না।' একটু থামল ঊর্মি।

'এতকিছুর পরও যদি তোর মনে হয় তোর ভাণ্ডারে টিরার স্বপক্ষে আরও যুক্তি আছে, তাহলে ঝেড়ে দে।'

'কালকের কথা বাদ,' বলল সৌরভ। 'আজকে তো কেউ

কারও জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। কে জানে, রাজা হয়তো স্রেফ ঘুরতে গেছে। আর এদিকে আমরা কল্পনায় হাতি-ঘোড়া সব মেরে শেষ করে দিচ্ছি।'

'ঠিক বলেছিস,' ঊর্মি মাথা ঝাঁকাল। 'আমাদেরকে এখন জানতে হবে রাজা কোথায়! ওর হয়েছে কী!'

'এখানে সময় নষ্ট না করে তা-ই চল,' জ্যোতি বলল। 'খুঁজে দেখি কোথায় আছে রাজা। টিরাকে পাওয়া গেলে আরও ভাল। ওর সঙ্গেও কথা বলে দেখব প্রশ্নগুলোর জবাব পাওয়া যায় কি না।'

চাপা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ঊর্মি। 'চল। কিন্তু ব্যাপারটা এত সহজ হবে বলে মনে হয় না।'

ওরা ঘুরে দাঁড়িয়েছে, এমন সময় রাজাকে দেখা গেল। ভারিক্কি চালে হেঁটে আসছে। ভাব দেখে মনে হলো মর্নিং ওয়াক করে আসছে।

অবাক হলো সবাই, পালা করে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাতে লাগল।

দলটার সামনে এসে দাঁড়াল রাজা। চুল এলোমেলো। চোখ লাল। চেহারায় একটা ড্যাম কেয়ার ভাব। ওদেরকে দেখে খুশি হয়নি মনে হলো।

'কি রে, রাজা!' ভুরু নাচাল উপম। 'এমন চেহারা হয়েছে কেন তোর? কোথায় গিয়েছিলি? এই দেখলাম ঘুমাচ্ছিস, এই দেখি হাওয়া। ব্যাপার কী?'

পাত্তা দিল না রাজা। লাল চোখ মেলে ওদেরকে দেখল। কিছু সন্দেহ হয়েছে হয়তো। 'তোরা সব এক জায়গায়?' পাল্টা প্রশ্ন করল। 'ব্যাপার কী? মিটিং করছিস মনে হয়?'

'তোর কথাই আলোচনা করছিলাম,' ঊর্মি বলল।

'আমার কথা!' টিটকারির বাঁকা হাসি ফুটল ওর মুখে। 'কী সৌভাগ্য আমার। তা আমার প্রতি তোদের এই অযাচিত করুণার কারণটা জানতে পারি?'

ওর ত্যাড়া মন্তব্যে সবার মেজাজ বিগড়ে গেল। কিন্তু পাল্টা আক্রমণ করল না কেউ।

জ্যোতি নরম গলায় বলল, 'কেউ করুণা করছে না তোকে। কাল কিছু একটা ঘটেছিল তোর। তার কোন প্রতিক্রিয়া হয়েছে কি না, আমরা তাই নিয়ে আলোচনা করছিলাম।'

'ও! তাই বল।' বিচ্ছিরি শব্দ করে হাই তুলল রাজা। 'ভাবছি আরও কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নেব। গা-টা কেমন যেন ম্যাজ-ম্যাজ করছে।'

উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল ঊর্মি। 'বেশি খারাপ লাগছে নাকি? কাল যা ঘটল, তাতে তো লাগারই কথা!'

'কাল কিছুই ঘটেনি!' ধমকের সুরে বলল রাজা। মুহূর্তে বিরক্ত, উত্তেজিত হয়ে উঠল। 'আমি তোদেরকে বলেছি ওসব কথা ভুলে যেতে!'

'কিন্তু ব্যাপারটা ভুলে যাওয়ার মত নয়,' তিয়ানা প্রতিবাদের সুরে বলল।

ঊর্মি মাথা ঝাঁকাল। 'অবশ্যই! তুই কতখানি অনুভব করতে

পেরেছিস আমরা জানি না, তবে আলোর বলটা যে ভালমতই তোকে আক্রমণ করেছিল, তা বুঝি। আমাদের চোখের সামনেই তো ঘটেছে পুরোটা। এখন তুই ভুলে যেতে বললেই হলো? কিছু না কিছু প্রতিক্রিয়া নিশ্চয়ই...'

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ঝগড়া করার জন্য কোমর বাঁধল রাজা। 'কী প্রতিক্রিয়া হয়েছে? কী প্রতিক্রিয়া দেখতে পাচ্ছিস আমার মধ্যে? তোরাই বল। আমার চেহারা বিগড়ে গেছে? নাকি চামড়ার রঙ পাল্টে গেছে?'

ওর এরকম মারমুখী, ঝগড়াটে ভাব-সাব দেখলে অন্য সময় নিশ্চয়ই রেগে উঠত সবাই, কিন্তু এখন পরিস্থিতির কথা ভেবে রাগল না।

জ্যোতি ওর পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে নিয়ে নরম গলায় বলল, 'রাজা, চোখে পড়ার মত শারীরিক কোন প্রতিক্রিয়া তোর হয়নি সত্যি, কিন্তু কিছু একটা অবশ্যই হয়েছে।'

'কী সেটা?' কোমরে হাত রেখে দাঁড়াল ও।

'তোর ব্যবহার পাল্টে গেছে,' ঊর্মি বলল। 'আমাদের চেনা রাজার ব্যবহার কখনও এত রূঢ় ছিল না। কাজেই...'

শব্দ করে হেসে উঠল রাজা। কিন্তু সে হাসি আন্তরিক নয়, কেমন যেন নাটুকে। 'শোন, সকালে ঘুম থেকে উঠে সবে লেট মর্নিং ওয়াক থেকে এলাম। এ সময় যে-কারও মুড খারাপ থাকতেই পারে। তাছাড়া তোদের কথা একেবারে মিথ্যেও নয়, আমি এখনও কালকের ধাক্কা পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারিনি। হয়তো আরেকটু ঘুমিয়ে উঠলে ঠিক হয়ে যাবে।'

'তাহলে এক কাজ...'

হাত তুলে সৌরভকে থামিয়ে দিল ও। 'প্লিজ, আর কোনও পরামর্শ না। তোরা যা করছিলি কর গিয়ে, আমি আরেকটু ঘুমিয়ে নিই। কারও কোন আপত্তি আছে?'

প্রশ্ন করার ঢঙ দেখে গা জ্বলে গেল ঊর্মির। বলল, 'দাঁড়া, দাঁড়া! এখানে আমরা সবাই তোর বন্ধু। তোর কথা ভেবে উদ্বিগ্ন। তুই এভাবে এক কথায় আমাদেরকে থামিয়ে দিতে পারিস না।'

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে হতাশ হওয়ার ভঙ্গি করল রাজা। 'তা হলে কী করতে বলিস আমাকে?'

'যাবার আগে অন্তত আমার একটা প্রশ্নের জবাব দিয়ে যা।'

'প্রশ্নটা কী?'

'তুই এখন কোথায় গিয়েছিলি?'

চোখ কুঁচকে উঠল রাজার। 'বুঝলাম না। বললামই তো, লেট মর্নিং ওয়াক...'

'নাকি টিরার সঙ্গে দেখা করতে?' জ্যোতি প্রশ্ন করল।

'কী?'

'না, মানে, মেয়েটার...'

'কারও সঙ্গে দেখা করতে যাইনি আমি।'

'ঠিক তো?' ঊর্মি বলল।

'আরে! মাথা খারাপ হলো নাকি তোদের? কী আশ্চর্য! আমি ওর বাসার ঠিকানা জানি যে দেখা করতে যাব? এসব প্রশ্ন কেন করছিস তোরা?'

কিছু চিন্তা করল ঊর্মি। 'এমনিই। স্রেফ কৌতূহল আর কী!

ঠিক আছে, তুই ঘুমো গিয়ে।'

'তার আগে নাস্তা খেয়ে নিলে ভাল হত,' জ্যোতি বলল তাড়াতাড়ি। 'আন্টি তোর জন্য অপেক্ষা করছেন।'

'ঠিক আছে,' মাথা ঝাঁকাল ও।

রাজা চোখের আড়ালে চলে যেতে জ্যোতি বলল, 'এখন আমরা কী করি?'

'টিভি দেখি গিয়ে, চল,' উপম বুদ্ধি দিল। 'বাইরে ঘোরাঘুরির চেয়ে সেটাই ভাল হবে।'

'তারচে' সি বিচে গেলে কমন হয়?' তিয়ানা বলল।

উর্মির কানে গেল না কথাগুলো। আপনমনে বলল, 'রাজাকে কখনও এত বাজে ব্যবহার করতে দেখিনি।'

'আমিও না,' জ্যোতি মাথা ঝাঁকাল। 'ও নিশ্চয়ই পুরোপুরি সুস্থ না। হয়তো ঠিকমত ঘুমাতে পারলে সুস্থ হয়ে উঠবে।'

'উঠবেই, এমন নিশ্চয়তা কে দিল তোকে?' উর্মি বলল। 'আরও খারাপও তো হতে পারে। কাল তুই-ই না বলেছিলি, বলটা রাজাকে গ্রাস করার পর টিরার চোখে কেমন খুশির আলো ফুটেছিল?'

চিন্তিত দেখাল জ্যোতিকে। 'হ্যাঁ। তাতে কী?'

'তা জানি না,' মাথা নাড়ল ও। 'জানতে হবে। মেয়েটার মতলব কি বুঝতে হবে।'

'আমার মনে হয় এর মধ্যে টিরার কোন হাত নেই,' ইমরান বলল। 'বলগুলো তো ওর ইচ্ছায় আসেনি।'

'ওর ইচ্ছাতেই এসেছে! কোন ভুল নেই!' জোর দিয়ে বলল

জ্যোতি। 'মেয়েটার সঙ্গে কথা বলতে হবে আমাদেরকে। যত তাড়াতাড়ি পারা যায়।'

'আমারও তাই মনে হয়,' উর্মি সায় দিল। 'কিছু প্রশ্নের জবাব পেতে হবে।'

কিন্তু রহস্যময় মেয়েটা শহরের কোন্ অংশে থাকে, কোন্ পাড়ায়, কেউ জানে না। কাজেই প্ল্যানটা তখনকার মত মুলতবী না রেখে উপায় থাকল না ওদের।

ছয়

দীর্ঘ সময় পরামর্শ করে নতুন করে ভাবতে লাগল ওরা–টিরার বাসা খুঁজে বের করবে। প্রয়োজনে সারা কক্সবাজার শহর চষে বেড়াবে ওরা, তবু মেয়েটাকে চাই।

বের হওয়ার জন্য সবাই প্রস্তুত, এমন সময় সৌরভ বলল, 'বাইরে ঘোরাঘুরি না করে এখানে বসেই তো গোয়েন্দাগিরি করতে পারি আমরা!'

'মানে?' জ্যোতি বলল।

'টিরা যদি কাল কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে আমাদেরকে লেকের কাছে নিয়ে গিয়ে থাকে, তা হলে আলোর বলের প্রতিক্রিয়া জানতে আজ একবার না একবার রাজার কাছে আসবেই।'

'তা ঠিক।'

'তা হলে আর আমাদের গরু খোঁজা করার দরকার কি? আমরা অপেক্ষা করলেই তো পারি!'

'যদি না আসে?' উপম বলল। 'এমনিতেই ঘটনায় অনেক প্যাঁচ লেগে গেছে। তারপর আবার যদি...'

'নতুন কোন প্যাঁচ লাগবে না ঘটনায়,' ঊর্মি বলল। 'তুই নিশ্চিত থাক।'

তিয়ানা বলল, 'তারপর কী? টিরা এলে কি ওর সঙ্গে কথা বলে...'

'আমি ওর সঙ্গে কথা বলতে মোটেও আগ্রহী নই। আমি ওদেরকে ফলো করতে চাই। ওরা কোথায় যায়, কী করে, নজর রাখতে চাই।'

'সেটা কি ঠিক হবে?' উপম গাল চুলকাল। 'রাজা আমাদের বন্ধু। ওকে অনুসরণ করা...'

'বন্ধু বলেই তো অনুসরণ করতে হবে,' জোর দিয়ে বলল জ্যোতি। 'নইলে ওর মধ্যে কী গড়বড় ঘটে গেছে, তা বুঝব কীভাবে?'

'তা ঠিক,' মাথা দোলাল উপম। 'কিন্তু টিরা যদি শেষ পর্যন্ত না আসে?'

'আমার ধারণা আসবে,' জ্যোতি বলল দৃঢ় কণ্ঠে। নিজেকে সমর্থন জানানোর ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল। 'আসবেই। আসতেই হবে ওকে।'

অন্যরা কিছুটা অবাক হলো জ্যোতির স্থির এই বিশ্বাস দেখে।

'আসতেই হবে, এমন কথা জোর দিয়ে বলিস কীভাবে?' তিয়ানা প্রশ্ন করল।

'গোটা ব্যাপারটা ভাল করে ভেবে দেখলেই বুঝবি কীভাবে বললাম,' জ্যোতি মাথা ঝাঁকাল। 'কাল টিরাই লেকের পারে নিয়ে গিয়েছিল আমাদেরকে, ঠিক?'

'হ্যাঁ,' উপম মাথা দোলাল।

'তারপর কায়দা করে লেকের শেষ মাথায় নিয়ে গিয়েছিল। ঠিক?'

'ঠিক।'

'তারপর বলগুলো দেখা দিতে কী বলল? ওগুলো সে আগেও দেখেছে, তাই না? বলগুলো যে লাইটনিং বল না, সে কথাও টিরা জানত, তাই না?'

'সবই ঠিক আছে,' উপম বলল। চিন্তিত। 'কিন্তু তুই আসলে কী বোঝাতে চাইছিস?'

'আমি বোঝাতে চাইছি,' জ্যোতি বলল। 'বলটার কার্যকারিতা সম্পর্কে খুব ভাল জানা ছিল টিরার। হাত বাড়ালে ওগুলো যে নেমে আসবে, তা জানত ও। নেমে এসে কারও মধ্যে ঢুকে যাবে, সেটাও। ওটা যাতে রাজার মধ্যে ঢোকে, আমার সন্দেহ তা জেনেই হাত তুলেছিল টিরা।'

'কথাটা আন্দাজে ঢিল মারার মত হয়ে গেল!' সৌরভ বলল। 'ঝড়ে বক মরে আর ফকিরের কেরামতী বাড়ে ধরনের। রাজা বাধা দিতে না গেলে তো বলটা ওর মধ্যেই ঢুকে যেত।'

জ্যোতি মুখ টিপে হাসল। 'আমার সন্দেহ, রাজা বাধা দেবে

জেনেই কাজটা করেছিল টিরা। কারণ মেয়েটাকে দেখার পরদিন থেকেই আমার সন্দেহ হচ্ছিল রাজাকে সম্মোহিত করে ফেলা হয়েছে। রাজা টিরার ইচ্ছামত চলছে।'

উর্মির দিকে ফিরে হাত তুলে আত্মসমর্পণের ভঙ্গি করল। 'এ নিয়ে তর্ক করে লাভ নেই, কারণ আমার ধারণা ঠিক, না বেঠিক, তা এখনই প্রমাণ করতে পারব না আমি। এখন আমাদেরকে রাজার উপর নজর রাখতে হবে। তা হলে টিরাকেও পাব আমরা। যা যা জানতে চাই, জেনে নিতে পারব।'

রাজার উপর নজর রাখার জন্য উপযুক্ত একটা জায়গা খুঁজে বের করল ওরা। সরোয়ার সাহেবের বাড়ির সামনে ছোট একটা মাঠ আছে। মাঠের মাঝখানে বড় একটা অশত্থ গাছ। ওটার নীচে বসলে রথ দেখা আর কলা বেচা, মানে গল্প করা আর রাস্তার উপর নজর রাখা, দুটোই একযোগে চালানো যাবে।

দূর থেকে বাড়িটার উপর নজর বোলাল জ্যোতি। ছয় রুমের বাড়িটা মানি প্ল্যান্ট লতার নীচে প্রায় চাপা পড়ে আছে। ওরা যে রুমে আছে, সেটার ঠেলে রাখা দরজার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ কেমন সন্দেহ জাগল ওর।

মনে হলো রাজা সম্ভবত নেই। ওর সন্দেহের কথা শুনে শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল উর্মির। তিয়ানা বলল, 'কী করে বুঝলি ও নেই?'

'বুঝিনি, অনুমানে বলছি,' হাসল জ্যোতি। বলল, 'রহস্য আর রোমাঞ্চ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে গিয়ে আমার অনুমান শক্তি মনে হয় কিছুটা বেড়ে গেছে। অবশ্য ভুলও হয়ে থাকতে পারে আমার।

তোরা থাক, আমি দেখে আসি ও আছে কি না।'

'না, আমরাও আসব,' ঊর্মি বলল।

একটু পর ঠেলে রাখা দরজাটা আস্তে করে ঠেলে ঘরের মধ্যে পা রাখল জ্যোতি। রাজার বিছানার দিকে তাকাল। ফাঁকা। চাদর টানটান করে বিছানো।

খাটের বাজুতে রাজার ট্রাউজার আগের মতই ঝুলছে। অ্যাঙ্কেল-হাই বুটও নেই।

তার মানে, ও তখন আরেকটু ঘুমিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে মিথ্যে কথা বলেছিল! ভাবল জ্যোতি। কারণ কী? ওদের কাছ থেকে আত্মগোপন করার সুযোগের জন্য? তা-ই বা কেন করবে রাজা? ওর কী দরকার পড়ল মিথ্যের আশ্রয় নেওয়ার?

'আশ্চর্য!' তিয়ানা বলল। 'অথচ তখন রাজা এমন ভাব করছিল যেন কত টায়ার্ড! দাঁড়িয়ে থাকতেও কষ্ট হচ্ছে। এখন গেল কোথায়?'

ঊর্মি বলল, 'কখন গেছে, তাই বা কে জানে? অদ্ভুত কাণ্ড তো!'

মাথা নাড়ল জ্যোতি। চোখ কুঁচকে কী এক গভীর চিন্তায় ডুবে আছে। 'ভুল। কাণ্ডটা অদ্ভুত না। অদ্ভুত হচ্ছে রাজা নিজে। আমি মনে হয় বুঝতে পারছি ওর উদ্দেশ্য। আমাদের হাত থেকে উদ্ধার পেতে চাইছে ও।'

'কারণ?' তিয়ানার চেহারা বিগড়ে গেল।

'কারণ...আমার মনে হয়, কালকের আলোর বলটা ওকে যে ভাবেই হোক, বদলে দিয়েছে,' নিচু গলায় বলল ও। 'রাজা এখন

আর আগের রাজা নেই।'

'তার মানে?' ঊর্মি বলল। 'কী বলতে চাইছিস তুই?'

'আমি যা বলতে চাইছি,' বলে খানিক ইতস্তত করল জ্যোতি। 'তা হলো, রাজার আত্মা এখন আর রাজার নেই, খুব সম্ভব। ওটার ওপর আর কোন দুষ্ট আত্মা ভর করেছে।'

পালা করে জ্যোতি ও ঊর্মির দিকে তাকাতে লাগল তিয়ানা। হাসবে না কাঁদবে, বুঝে উঠতে পারছে না। 'এসব আবার কী কথা?'

'এমন আজব কথা কখনও শুনিনি!' ইমরান বলল।

'ঠিক,' উপম বলল। 'যতসব ঘটনায় প্যাঁচ লাগানো কথা। শুনলে গা চুলকায়।'

'শোন,' জ্যোতি অস্থির হয়ে উঠল। 'আমি যা বলছি, তা সম্পর্কে আমি নিজেই ঠিকমত নিশ্চিত নই। তবু সহজ যুক্তিতে যা মনে আসছে, তাই বলছি।'

'ঠিক আছে, বলে যা,' ঊর্মি বলল।

'আলোর বলগুলো যে কোন স্বাভাবিক জিনিস হতে পারে না, তাতে কোন সন্দেহ আছে তোদের?'

সবার উপর চোখ বুলিয়ে নিল জ্যোতি। অনড় প্রত্যেকে। কারও চোখে পলক পড়ছে না।

'নেই,' আবার শুরু করল ও। 'তাই তো? এখন যদি আমি ধারণা করি, ওগুলোর মধ্যে আত্মাই ছিল, তা হলে কি অন্যায় করা হবে? আমার সন্দেহ ওগুলো তাই। দুষ্ট আত্মা। হয়তো অন্য কোন গ্রহ থেকে এসেছে। যদি দেখি রাজা এরমধ্যে দানব হয়ে

গেছে, হাতের কাছে যা পাচ্ছে তাই কাঁচা চিবিয়ে খাচ্ছে, আমি অন্তত অবাক হব না।'

চুপ করে থাকল সবাই। কারও মুখে কথা নেই। নীরবে একজন আরেকজনের মুখের দিকে তাকাচ্ছে।

'কিন্তু শুধু একতরফা বিচার করলেই তো হবে না,' উপম বলল। 'বলগুলো ভাল কিছুও তো হতে পারে!'

দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়ল জ্যোতি। 'আমার মন বলছে হতে পারে না। আর এসবের জন্য টিরা মেয়েটাই দায়ী। ও আলোগুলোর পক্ষে কাজ করে। ওকে নিয়ে ঊর্মি আপুর সন্দেহ কাল আমরা ভাল চোখে দেখিনি। কিন্তু দেখা উচিত ছিল। তা হলে হয়তো এ সমস্যা আমরা এড়াতে পারতাম।'

'কিন্তু···কিন্তু টিরা তো কোন দানব না,' কোনমতে বলল সৌরভ। 'ও তো একটা মেয়ে। ঊর্মি আপু আর তিয়ানার মতই। তবে চেহারা-সুরতে অসাধারণ।'

'তা ঠিক। কিন্তু অসাধারণ সুন্দরী বলেই ও মানুষ, এমন কোন নিশ্চয়তা কি আমরা পেয়েছি? পাইনি। বলগুলোর ব্যাপারে আমার সন্দেহ যদি সত্যি হয়, তা হলে বলব ওরা ভিনগ্রহ থেকে এসেছে। নিজেদের দল ভারী করার জন্য ট্রান্সফরমেশনের মাধ্যমে লোক সংগ্রহে নেমেছে। শোন, আমাদের কথা বেশি বলা হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কাজ তেমন হচ্ছে না। বেশি দেরি হয়ে যাওয়ার আগে আমাদেরকে রাজাকে খুঁজে বের করতে হবে এখন। এ ধরনের ট্রান্সফরমেশন বন্ধ করতে হবে।'

'কিন্তু কোথায় খুঁজব?' ইমরান বলল ব্যস্ত ভঙ্গিতে। 'কোথায়

আছে ও কে জানে!'

'আমার মনে হয় এখন ওকে লেকের কাছেই পাওয়া যাবে,' জ্যোতি বলল।

'কেন? ওখানে কেন যাবে?' তিয়ানা বলল। 'টাউনেও তো থাকতে পারে। হয়তো টিরার সঙ্গে কোথাও গল্প করছে।'

'থাকতে পারে, জানি না,' মাথা নাড়ল ও। 'অথবা হয়তো লেকের পাড়ে বলগুলোর সঙ্গে খেলা করছে। হাজার হোক, ওরা রাজার নতুন জাতভাই।'

'তাহলে তো ওখানে যাওয়া ঠিক হবে না,' উপম বলল। 'বিপদ হতে পারে।'

'রাজা থাকলে আমাদের কোন বিপদ হবে না।' ঊর্মি বলল দৃঢ়কণ্ঠে। 'অ-সম্ভব! ও যতই বদলে গিয়ে থাকুক, আমাদের ক্ষতি হতে দেবে না, দেখিস!'

জ্যোতি ক্রমে গম্ভীর হয়ে উঠল। 'ও এখনও সেই রাজাই আছে, এতটা আশা করা কি ঠিক হচ্ছে?'

দুই কোমরে হাত রেখে দাঁড়াল উপম। 'তুই ব্যাটা সবকিছুর মধ্যে জুজু বুড়ি দেখতে পাস।'

'আমি ব্যাপারটাকে যুক্তির চোখে দেখার চেষ্টা করেছি,' বলল জ্যোতি। 'মনগড়া কিছু চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করিনি। তোরাই ভেবে দেখ, আলোর বল, রাজা আর টিরা সম্পর্কে আমি যা বলেছি, তার মধ্যে অযৌক্তিক কিছু আছে কি না! আর চোখে দেখা যাচ্ছে না মানে এই নয় যে রাজা ও টিরা এখানে নেই। হয়তো আড়ালে আছে। সুযোগ পেলেই ধরবে আমাদেরকে।'

একটু ভাবল ও। 'এক কাজ করা যাক। আমরা দু'দলে ভাগ হয়ে ওদেরকে খুঁজতে বের হই। একদল টাউনে খুঁজব, আরেকদল লেকের কাছে। এদিকে আমি... ।'

সাত

সরোয়ার সাহেবের পাশের বাড়ির অঞ্জনদের শুধু ডেকরেটরের ব্যবসা ছিল। ইদানীং তার সঙ্গে যোগ হয়েছে সাইকেল, প্যাডেল বোট ইত্যাদি ভাড়া দেওয়া।

সৈকতে বেড়াতে আসা অনেকেই বাড়তি বিনোদনের জন্য ওসব ভাড়া নেয়। তাড়াতাড়ি কাজ সারার জন্য সেখান থেকে ছয়টা সইকেল ভাড়া করল ওরা।

উপম, সৌরভ আর ইমরান শহরে খুঁজবে রাজা ও টিরাকে। উর্মি আর তিয়ানা যাবে লেকের দিকে। জ্যোতির অন্য কাজ আছে।

কিন্তু কিছুদূর যাওয়ার পর উর্মিদের মনে হলো সাইকেলের চেয়ে হেঁটে যাওয়াই ভাল ছিল। কারণ লেক পর্যন্ত পুরোটা পথ চড়াই পেরিয়ে যেতে হয়। অনেক পরিশ্রমের কাজ।

তবু এক মিনিটের জন্যও কোথাও থামল না ওরা। টানা চালিয়ে লেকের কাছে পৌঁছে হাঁপাতে লাগল। কিন্তু যাদের খোঁজে

আসা, তাদের ছায়া পর্যন্ত না দেখে এত কষ্ট বিফলে গেল ভেবে হতাশ হলো উর্মি।

তিয়ানাও কম হতাশ হলো না। লেকের আশপাশে তো দূরের কথা, ধারেকাছের কয়েকশো গজের মধ্যে রাজা বা টিরার ছায়াও নেই।

কোন আলোর বলেরও দেখা নেই।

'এখন যদি রাজা আমাদের ধরে ফেলে?' উর্মি বলল।

'আমার মনে হয় না,' বলল তিয়ানা। 'এখানে ও থাকলে তো ধরবে। ওর...'

কথাটা বলা শেষ হয়েছে কি হয়নি, আচমকা সাইকেল নিয়ে লেকের ওপারের ছোট পাহাড়টার মাথায় উদয় হলো রাজা। ওটাও অঞ্জনদের দোকানের।

ওদের বিস্ময়ের ঘোর ঠিকমত কাটার আগেই সাইকেল নিয়ে সাঁ-সাঁ করে নেমে আসতে লাগল রাজা। খুব দ্রুত প্যাডেল ঘোরাচ্ছে ও, উঁচু-নিচু ঢাল বেয়ে লাফাতে লাফাতে নেমে আসছে।

তবে 'হাই,' 'হ্যালো' করতে যে নয়, সেটা বুঝতে কারও বাকি থাকল না।

ওর চাউনি অদ্ভুত মনে হলো ওদের। সোজা কথায় মানুষের অভিব্যক্তি নয় সেটা। তীব্র ঘৃণা ফুটে আছে ওর চেহারায়। তার চেয়েও খারাপ কথা, চাপা উজ্জ্বল আলোর একটা বলয় ঘিরে আছে ওর দেহকে।

ভয়ে কিছুক্ষণের জন্য জমে থাকল ওরা, পর মুহূর্তে সাইকেল ঘুরিয়ে পিঠটান দিল। পাগলের মত প্যাডেল মারতে লাগল।

কিন্তু তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে সব গোলমাল করে দিল। কোথায় সাইকেল ঘুরিয়ে নিয়ে টাউনের দিকে ছুটবে, তা না! মাথা আতঙ্কে ঠিকমত কাজ না করায় তিয়ানা উল্টোদিকে ছুটল। লেকের দিকে।

ওদিকে ঊর্মিও একই কাজ করে বসল। ছুটতে ছুটতে কাঁধের উপর দিয়ে ঘুরে তাকাল, দেখল ওর সঙ্গে দৌড়ে সুবিধা করতে না পেরে তিয়ানার দিকে তেড়ে যাচ্ছে রাজা।

সেকেন্ডের জন্য সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগল ঊর্মি। ভয়ে সর্বাঙ্গ কাঁপছে ওর। কারণ আলোর বলয়টার জন্য তেড়ে আসতে থাকা রাজাকে একটা মূর্তিমান আতঙ্কের মত লাগছে। জীবনে এত ভয় কখনও পায়নি ঊর্মি। কিন্তু তাই বলে চোখের সামনে রাজা বিনা বাধায় তিয়ানাকে আক্রমণ করবে, তা হতে দিতে পারে না ও।

মুহূর্তের জন্য সামনে তাকাল ঊর্মি। এ মুহূর্তে নিরাপদ ও। কারণ ওর দিকে নজরই নেই রাজা নামের দানবটার।

কিন্তু তিয়ানা বিপদে আছে।

করণীয় ঠিক করে নিয়ে দ্রুত সাইকেল ঘুরিয়ে নিল ও, পরমুহূর্তে যত জোরে সম্ভব রাজা ও তিয়ানার পিছন পিছন ছুটল।

'দানবটাকে ঠেকাতে হবে,' বিড়-বিড় করে বলল ও। 'যে ভাবে হোক ঠেকাতেই হবে।'

এরমধ্যে লেকের কিনারায় পৌঁছে গেছে তিয়ানা। রাজা রয়েছে কম করেও দু'শো গজ পিছনে। কিন্তু তারপরও সুবিধা করতে পারছে না ও। কারণ রাজা খুব দ্রুত সাইকেল চালিয়ে দু'জনের মাঝের ব্যবধান কমিয়ে আনছে।

আলোর বলের শক্তিতে একরাতের মধ্যে অতিপ্রাকৃত ক্ষমতার অধিকারী হয়ে গেছে রাজা। গায়ের বল দ্বিগুণেরও বেশি বেড়ে গেছে ওর। কাজেই দ্রুতগামী কারের মত সাইকেল ছোটাচ্ছে ও। ঊর্মি বুঝতে পারছে, আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই তিয়ানা ধরা পড়ে যাবে—ও কোন সাহায্য করতে পারার আগেই।

ওর সামনে রয়েছে রাজা ও তিয়ানা। হাঁ-হাঁ করে নীচের দিকে ছুটে যাচ্ছে। ওদের রাস্তা সামনে গিয়ে ডানদিকে বেঁকে গেছে দেখে একটা বুদ্ধি এল ঊর্মির মাথায়। সাইকেল নিয়ে কোনাকুনি, শর্টকাট পথে রাস্তার ও মাথায় পৌঁছার জন্য ছুটল ও।

ভাল কাজ হলো তাতে। কোনাকুনি ছোটার ফলে অল্পক্ষণের মধ্যে রাজার প্রায় পাশাপাশি চলে এল ঊর্মি, মাঝখানের ব্যবধান যদিও বিস্তর। তবে হিসাব করলে দেখা যায়, রাজা এক অর্থে ওর নাগালের মধ্যেই আছে।

কড়া ব্রেক করে সাইকেল দাঁড় করিয়ে ফেলল ঊর্মি, লাফ দিয়ে নেমে সামনে পড়ে থাকা টেনিস বল সাইজের একটা পাথর তুলে নিল। পাথর ছোঁড়ায় এক্সপার্ট ঊর্মি, কাজেই মিস হলো না। উড়ে গিয়ে রাজার সামনের চাকার স্পোকের মধ্যে ঢুকে পড়ল ওটা।

বন-বন করে ঘুরছিল চাকাটা, আচমকা বিকট কট-কট শব্দে থেমে গেল। গণ্ডা গণ্ডা স্পোক ভাঙাচোরার শব্দের সঙ্গে ওটার পিছনের চাকা সাঁই করে শূন্যে উঠে গেল। একই মুহূর্তে রাজাও এক দানবীয় পাখির মত উড়াল দিল।

দুই হাত ডানার মত দু'দিকে মেলে দিয়ে দশ-পনেরো গজ

দূরে গিয়ে চার হাত-পা দিয়ে কোলাব্যাঙের মত আছড়ে পড়ল।

পিছনে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল তিয়ানা। দাঁড়িয়ে পড়তে যাচ্ছিল, কিন্তু উর্মি হাত তুলে নিষেধ করল। 'যা, যা!' চেঁচিয়ে বলল ও। 'থমিস না! পালা। টাউনের দিকে চলে যা!'

'রাজার কী হয়েছে?' পাল্টা চিৎকার করে জানতে চাইল ও।

'জ্যোতি যা বলছিল তাই হয়েছে! ও একটা দানব হয়ে উঠেছে!'

পিছনে রাজাকে সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়াতে দেখল উর্মি। সাইকেলটা তুলে নিয়ে আগুনঝরা চোখে ওদেরকে দেখল সে। তবে সাইকেলে চড়ার ব্যাপারে কোন তাড়া দেখা গেল না ওর মধ্যে। ব্যাপারটা চিন্তায় ফেলে দিল উর্মিকে। কী বদ পরিকল্পনা করছে রাজা?—ভাবল ও।

জোরে সাইকেল চালিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে তিয়ানাকে ধরে ফেলল উর্মি। অবশ্য জোরে চালানোর কৃতিত্বের পুরোটা ওকে দিলে ভুল হবে। কারণ উর্মি যাতে নাগাল পায়, সে জন্য তিয়ানাও আস্তেই চালাচ্ছিল। পরবর্তী করণীয় নিয়ে কথা বলার জন্য ওদের একত্রিত হওয়া জরুরি ছিল।

রাজা, বা এ মুহূর্তে আর যে নামই হোক না কেন ওর, এখনও আগের জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। লেকের ওপার থেকে একভাবে তাকিয়ে আছে এদিকে। ওকে ঘিরে আলোর বলয়টাকে ধীর গতিতে চক্কর খেতে দেখা গেল।

'কীসের জন্য অপেক্ষা করছে ও?' তিয়ানা প্রশ্ন করল। 'কী চায়?'

'আমাদেরকে চায়!' ঊর্মি শ্রাগ করল। 'সঠিক সুযোগের অপেক্ষায় আছে।'

'আমাদেরকে নিয়ে কী করবে?'

আবার কাঁধ ঝাঁকাল ও। 'কী আর করবে! আমাদের হৃৎপিণ্ড আর মস্তিষ্কের বৈদ্যুতিক চার্জ শুষে নিয়ে দেহটা শিয়াল, কুকুরের খাবার হিসেবে ফেলে রেখে যাবে।'

'না বোধহয়,' ঘন ঘন মাথা নাড়ল তিয়ানা। 'আমাদেরকেও মনে হয় নিজের মত ট্রান্সফরম করার মতলব আছে ওর। কীভাবে করবে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই বুদ্ধি আঁটছে এখন।'

'কথাটা আমিও ভেবেছি,' চারদিকে চোখ বুলিয়ে কিছু খুঁজল ঊর্মি। 'কিন্তু তেমন কোন লক্ষণ তো দেখছি না।'

'মানে?'

'মানে, আলোর সেই বলগুলো নেই এখন। ওগুলো ছাড়া...!' চমকে উঠল ঊর্মি। 'সর্বনাশ! এসে পড়েছে! ওই দেখ, তিয়ানা! আবার এসেছে বলগুলো। কালকের জায়গায়। ওই দেখ! এইবার বুঝলাম রাজা কেন অপেক্ষা করছিল। ও নিশ্চয়ই...'

'এখন কী হবে?' উদ্বেগ ফুটল ওর চেহারায়।

'যা-ই হোক, ভয় পেয়ে উল্টাপাল্টা কিছু করে বসিস না।'

'করব না,' বলল তিয়ানা। 'কিন্তু হাত-পা যে পেটের মধ্যে ঢুকে পড়ার অবস্থা হয়েছে, তার কী করব? আমি রাজার মত দানব হতে চাই না।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ঊর্মি। 'এখন দু'টো পথ খোলা আছে আমাদের সামনে। হয় রাজাকে যেভাবে হোক পিছনে ফেলে

পালিয়ে যাওয়া। নয়তো আল্যোর বলের শিকার হওয়া। কোনটা করবি তুই?'

'একটাও না!'

'কিন্তু…এ ছাড়া আর কোন উপায়ও তো চোখে পড়ছে না।' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ও। 'ইস, ভুল হয়ে গেছে। টাউনের দিকে না গিয়ে উল্টো আসাটা ভুল হয়ে গেছে! এখন হয় মরতে হবে, নয়তো…না! আমি এত সহজে হাল ছাড়তে রাজি নই। রাজা জিতে যাবে? অসম্ভব। হতে পারে না।'

'চুপ কর!' বলল তিয়ানা। 'আমাদের পলিটিশিয়ানদের মত ফালতু বক-বক করার অভ্যাস হয়ে গেছে তোর। অনেক বলেছিস, এবার রাজাকে কাট্টি মারার চেষ্টা করতে হবে। চেষ্টা করে দেখা যাক, আমাদের এত বছরের বন্ধুত্বের দোহাই দিয়ে ওর হাত থেকে বাঁচা যায় কি না।'

'কোন লাভ নেই,' মাথা নাড়ল ঊর্মি। 'ও কীভাবে জ্বল-জ্বল করছে দেখেছিস? ওকে ঘিরে থাকা আলোটা দেখ। তেজ আরও বেড়ে গেছে না?'

'তবু চল। চেষ্টা করে দেখি।'

ভয়ে ভয়ে রাজার দিকে এগিয়ে চলল ওরা।

ও এখন ঊর্মিদের টাউনের দিকে নেমে যাওয়ার পথ আগলে রয়েছে। সাইকেল নিয়ে ঘুরঘুর করছে অল্প খানিকটা জায়গার মধ্যে।

ঊর্মি আর তিয়ানা যত রাজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, ওকে ঘিরে থাকা অশুভ আলোটার ক্ষমতা আর উজ্জ্বলতা যেন ততই

বেড়ে চলেছে। কিন্তু রাজার চেহারায় কোন পরিবর্তন আসেনি। আগের মতই কঠোর, অভিব্যক্তিহীন। আস্ত একটা শয়তানের মত লাগছে।

দেখে মনে হলো না রাজা ওদেরকে চিনতে পেরেছে। চব্বিশ ঘণ্টা আগেও ছেলেটা ওদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের একজন ছিল, কিন্তু এখন ওকে দেখে তিয়ানা বা ঊর্মির তা বিশ্বাসই হতে চাইছে না।

আগে যে ওদের মধ্যে কখনও ঝগড়া বা কথা কাটাকাটি হয়নি, তা নয়। হয়েছে। কিন্তু তাই বলে কি রাজা কখনও এরকম কাঁচা খেয়ে ফেলার মত দৃষ্টিতে তাকিয়েছে? অসম্ভব!

তিয়ানা এবার সত্যি সত্যি আতঙ্কিত বোধ করল! বিড়-বিড় করে বলল, 'ও যেতে দেবে না আমাদেরকে!'

'তোর ধারণায় ভুলও থাকতে পারে,' ঊর্মি বলল।

'ওর সঙ্গে কথা বলে দেখব?' তিয়ানা রাজাকে দেখে নিল এক নজর।

'চেষ্টা করে দেখতে পারিস।'

চোখ কুঁচকে ঘুরে তাকাল তিয়ানা। 'আর তো কোন উপায় দেখছি না। তুই পেয়েছিস? কোন আইডিয়া আছে?'

'একটা আছে,' মাথা দোলাল ঊর্মি।

'কী?'

'রাজার মুঠো থেকে বের হতে হলে ওকে খুন করতে হবে। এ ছাড়া কোন উপায় নেই।'

'কী যা-তা বলছিস?' চেহারা বিগড়ে গেল তিয়ানার। 'মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি! রাজাকে খুন করবি? পারবি তুই? হাত

কাঁপবে না?'

'দেখ, তিয়ানা! তুই যেমন কাজটা করার কথা ভাবতে পারিস না, তেমনি আমিও ভাবতে পারি না। তবে তোকে এটাও বুঝতে হবে যে ও এখন আর রাজা নেই। মহাবিশ্বের আর কোন অন্ধকার গ্রহ থেকে আসা কোন শয়তান ভিনগ্রহবাসী হয়ে গেছে। সকালে হয়তো মানুষের মগজ দিয়ে নাস্তা খেয়ে এসেছে, দুপুরে আমাদেরকে দিয়ে লাঞ্চ করবে। এখানে মধ্যবর্তী কোন পথ নেই। হয় ও বাঁচবে, নয়তো আমরা। আমি আমাদের পক্ষে ভোট দিচ্ছি। যদি এদের আগ্রাসনের হাত থেকে পৃথিবীর মানুষকে রক্ষা করতে হয়, তা হলে আমাদেরকে বেঁচে থাকতে হবে। মরে গেলে চলবে না।'

'একেবারে মেরেই ফেলতে হবে কেন?' একটু চিন্তা করে বলল তিয়ানা। 'ওকে পাথর মেরে অজ্ঞান করে পালিয়ে যেতে পারি না আমরা? মার একটা পাথর!'

সাইকেল দাঁড় করিয়ে ফেলল ঊর্মি। 'চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে। কিন্তু তুই আবার বেশি কিছু আশা করিস না যেন!'

'তোর মত পাথর ছোঁড়ার এক্সপার্ট থাকতে আশা করলে দোষ কী?' সাইকেল থেকে নামল তিয়ানা। 'দাঁড়া, হাতের কাছে কিছু পাথর জোগাড় করে রাখি। রাজা কাছে এলে কাজে লাগবে।'

পাথর কুড়াতে শুরু করল তিয়ানা। ঊর্মিও হাত লাগাল ওর সঙ্গে। স্তূপ তৈরি করতে লাগল পাথরের। রাজা ওদের পিছনে থাকলেও বলগুলো এরমধ্যে ঘুরে প্রায় সামনের দিকে চলে এসেছে। রাজা এবং বল, দু'তরফ থেকেই মাঝের ব্যবধান কমিয়ে

ধীরে কমিয়ে আনা হচ্ছে। কোন পক্ষ আগে ওদের নাগাল পায়, সেটাই এখন দেখার বিষয়।

'ইস, এখন যদি হাতে একটা অস্ত্র থাকত!' তিয়ানা বলল। 'রাজাকে ভয় দেখিয়ে দূরে সরিয়ে রাখা যেত।'

'কেন? একবারে খতম করে দিলে কী হত!'

'আবার সেই কথা?'

'কেন? আত্মরক্ষার জন্য খুন করায় দোষ নেই জানিস না?' ঊর্মি বলল।

'রাজাকে খুন করার কথা তুই এত ঠাণ্ডা মাথায় বলিস কী করে?' অবাক হয়ে বান্ধবীর দিকে তাকাল তিয়ানা।

ঊর্মি কড়া কোন জবাব দেওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়িয়েও থেমে গেল। ওর চোখে পানি দেখে তাজ্জব হয়ে গেল তিয়ানা। সব ভুলে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল।

হাতের পাথর ফেলে ওর দিকে এগিয়ে গেল তিয়ানা। 'কী রে! কাঁদছিস কেন?'

চোখের পানি মুছে রাজাকে দেখে নিল ঊর্মি। 'তোর কি মনে হয় তুই একাই রাজার কথা ভাবছিস? আমি ভাবছি না? ওকে এই অবস্থায় দেখতে আমার খুব ভাল লাগছে?'

ওকে সান্ত্বনা দিতে তিয়ানা নিজেও কেঁদে ফেলল। এক হাতে চোখ মুছতে মুছতে বলল, 'সরি, ঊর্মি আপু! আমি অতকিছু ভেবে বলিনি। তুই ঠিকই বলেছিস। আমিও তোর মত একই কথা ভাবছি। আমারও খারাপ লাগছে রাজার কী হলো ভেবে।'

রাজা অনেক কাছে চলে এসেছে ওদের। ভীষণ আত্মবিশ্বাসী

দেখাচ্ছে ওকে। সাইকেল চালাচ্ছে আস্তে আস্তে। এক গজ, দু'গজ করে এগিয়ে আসছে–চেহারা দেখে মনে হয় একটা উন্মাদের মুখোশ পরে আছে যেন।

তারচেয়েও খারাপ কথা, ওর জ্বলজ্বলে চাউনিতে মানবিক সামান্যতম চিহ্ন পর্যন্ত নেই। রাক্ষসের মত বিরাট হাঁ করে এগিয়ে আসছে রাজা। পুরনো কয়লার রেল এঞ্জিনের মত ভোঁশ-ভোঁশ করে নিঃশ্বাস ছাড়ছে।

রাজা বিশ গজের মধ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত অপেক্ষা করল ওরা, তারপর একযোগে পাথরবৃষ্টি শুরু করল।

কিন্তু কোন লাভ হলো না।

একটা পাথরও লাগল না রাজার গায়ে। তার মানে এই নয় যে ঊর্মি-তিয়ানার লক্ষ্য ঠিক ছিল না। ঠিকই ছিল। কিন্তু...

রাজাকে আঘাত করার আগেই কোন এক রহস্যময় কারণে একে একে শূন্যে বিস্ফোরিত হতে লাগল ওগুলো। যেন অদৃশ্য কোন ঢালে বাড়ি খেয়ে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে।

শুধু তাই নয়। গুঁড়ো হয়ে ব্যাঙের ছাতার মত লাফিয়ে উঠছে শূন্যে। রাজা তার মধ্য দিয়ে অপ্রতিরোধ্য গতিতে অব্যাহতভাবে এগিয়ে আসছে।

অজান্তেই কয়েক পা পিছিয়ে এল ঊর্মি ও তিয়ানা। যদিও জানে লাভ হবে না। পালিয়ে যাওয়ার জায়গা নেই। সামনে শত্রু, পিছনেও শত্রু। কিছু করার নেই।

'ঊর্মি আপু,' তিয়ানা বলল। 'আর উপায় নেই মনে হচ্ছে। আজ আমরা গেছি!'

উর্মি কোন জবাব দিল না।

রাজা আর আলোর বল, দুই মহাবিপদ ক্রমে এগিয়ে আসতে লাগল ওদের দিকে।

আট

ওদিকে টিরার খোঁজে শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছে উপম, সৌরভ আর ইমরান। আলাদা আলাদা খুঁজতে বেরিয়েছে ওরা। সাইকেল নিয়ে এ-গলি সে-গলি করে বেড়াচ্ছে। কিন্তু দুপুর হয়ে আসার পরও খোঁজ পাওয়া গেল না মেয়েটার।

জ্যোতি একটা বিশেষ কাজে রয়েছে। কাজটা সেরে আসবে।

ঘুরতে ঘুরতে এক সময় বিরক্ত হয়ে উঠল সৌরভ। বাকি সবার খোঁজে ফিরে যাওয়ার আগে শেষ একটা চক্কর দিতে বের হলো। সৈকতে চলে এল ঘুরতে ঘুরতে।

সেখানেই পাওয়া গেল টিরাকে। একটা নিরিবিলি জায়গায় দাঁড়িয়ে পাখিদের রুটি খাওয়াচ্ছে।

কাছে যাওয়ার আগে মেয়েটার ওপর দূর থেকে কয়েক মিনিট নজর রাখল সৌরভ। ভাব দেখে মনে হলো কিছু ভাবছে। ওর এক হাতে একটা পাঁউরুটি। ছিঁড়ে ছিঁড়ে পাখিদের দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছে। বিড়-বিড় করে কী সব বলছে।

আর কী অদ্ভুত কাণ্ড! পাখিরা মনে হলো ওর কথা বুঝতেও পারছে।

দৃশ্যটা দূর থেকে দেখতে ভালই লাগল। নতুন করে ভাবতে বাধ্য হলো সৌরভ, মেয়েটার মধ্যে এমন কী আছে যে কারণে ওকে রহস্যময় মনে হয়? তেমন কিছুই তো চোখে পড়ছে না! গত কালকের আলোর বলগুলোর সঙ্গে ওর আচরণের ব্যাপারটা বাদ দিলে তো আর দশটা সাধারণ মেয়ের মতই লাগছে টিরাকে!

ঊর্মি আপু বা তিয়ানার সঙ্গে কোন তফাত নেই।

'টিরা!'

ডাক শুনে ঘুরে তাকাল মেয়েটা। ওকে ধীর পায়ে এগিয়ে আসতে দেখে হাসল। সৌরভের মনে হলো, সে হাসি দেখে ওর মাথার উপরে জমে থাকা মেঘ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। বাকি রুটি ফেলে এগিয়ে এল মেয়েটা।

'তুমি এখানে? কী ব্যাপার?'

'তোমার খোঁজেই এসেছি,' হাসল সৌরভ। 'আজ দিনের অর্ধেকটা তোমার খোঁজেই ব্যয় করলাম।'

কথাটা শুনে চেহারায় এক ধরনের সন্তুষ্টি ফুটল টিরার। 'কেন? অপরাধ করেছি কোন? অ্যারেস্ট করতে এসেছ!'

মৃদু শব্দ করে হাসল সৌরভ। মাথা নাড়ল। 'আমাদের আর সবাই তোমাকে সন্দেহের চোখে দেখে। কিন্তু আমার চোখে তো সেরকম কিছু পড়ছে না।'

কথাটা শুনে টিরার মুখের হাসি হোঁচট খেল। সৌরভের মাথার উপর দিয়ে দূরে, লেকের অবস্থানের দিকে তাকাল ও।

আচরণে অস্থিরতা ফুটল।

'কেন সবাই অপছন্দ করে? আমার অপরাধ কী?'

মাথা নাড়ল জ্যোতি। 'অপছন্দ করে বলিনি। সবাই আসলে রাজাকে নিয়ে উদ্বিগ্ন।'

'রাজা? কী করেছে ও?'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে অসহায় ভঙ্গি করল সৌরভ। 'আজ ও কেমন অদ্ভুত আচরণ করছে যেন। সবার ধারণা কালকের সেই আলোর বলগুলোর সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক আছে। আমাদের দলের ঊর্মি আপু আর তিয়ানার অনুমান, কাল তুমি আমাদেরকে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই লেকের কাছে নিয়ে গিয়েছিলে। তুমি জানতে ওখানে বলগুলো হাজির হবে।'

কেমন এক অদ্ভুত চোখে তাকাল টিরা। 'ওদের কথা ছেড়ে দাও, সৌরভ। তোমার কী মনে হয়?'

অস্বস্তি লেগে উঠল সৌরভের। শরীরের ভর এক পা থেকে আরেক পায়ে নিল। 'আমার কী মনে হয়? মনে হয়, ওরা ঠিকই ভাবছে। বলগুলোর সঙ্গে তোমার কোন না কোন সম্পর্ক আছে।'

সাগরের দিকে তাকাল টিরা। মনে হলো উঠে আসতে থাকা একটা দীর্ঘশ্বাস জোর করে চাপল। তারপর উদাস কণ্ঠে বলল, 'সাগরের চেহারা কখনও বদলায় না, জানো? বাজি ধরে বলতে পারি, হাজার হাজার বছর পরেও বঙ্গোপসাগর ঠিক এরকমই থাকবে। লক্ষ লক্ষ বছর পরেও এরকমই থাকবে। তাই না?'

'তাই তো থাকার কথা। পৃথিবীতে সাগর আর পাহাড়ের সৃষ্টি হয়েছে কোটি কোটি বছর আগে। হাজার বছর বা লক্ষ বছরে তার

কী এমন পরিবর্তন হবে?’ সৌরভ বলল।

মাথা দোলাল টিরা। চেহারা বিষণ্ন হয়ে উঠল। ‘ঠিক। কোন পরিবর্তন হবে না। এভাবেই থাকবে সাগর-পাহাড়। এভাবেই থাকবে। কিন্তু মানুষ থাকবে না। জন্ম হতে না হতেই মানুষ বুড়ো হতে শুরু করে। অল্প কয়েকটা বছর মাত্র, তারপরই সব ছেড়ে তাকে চলে যেতে হয়। নশ্বর দেহ হয় মাটির সঙ্গে মিশে যায়, নয়তো ছাই হয়ে উড়ে যায় বাতাসে।’

ও কী বলতে চায় বুঝতে পারল না সৌরভ। একেবারে পাকা দার্শনিকের মত কথা। এই বয়সের কোন মেয়ের মুখে কথাগুলো একেবারেই বেমানান।

‘ব্যাপার কী বলো তো!’ ওর দিকে দু’পা এগিয়ে গেল সৌরভ। ‘আজ তোমার কথাবার্তা কেমন কেমন যেন লাগছে!’

মাথা নাড়ল টিরা। ‘কেন জিজ্ঞেস করলে কথাটা?’

‘তোমাকে খুব চিন্তিত মনে হচ্ছে, তাই।’

‘তাই নাকি? আমি তো আরও তোমার ব্যাপারে একই কথা ভাবছিলাম।’

অবাক হলো সৌরভ। ‘আমার ব্যাপারে একই কথা ভাবছিলে?’

তখনই জবাব দিল না টিরা। চোখ কুঁচকে ওর পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বোলাল। তার কড়া দৃষ্টির সামনে অস্বস্তি বোধ করতে লাগল সৌরভ।

‘হ্যাঁ,’ বেশ কিছুক্ষণ পর মাথা দোলাল টিরা।

‘কিন্তু আমি মোটেই চিন্তিত নই!’ বলে একটু থামল। ‘একটু আগে পর্যন্ত ছিলাম। সকাল থেকে তোমার কোন খোঁজ পাওয়া

যাচ্ছিল না বলে।'

মাথা ঝাঁকাল টিরা। 'তোমাকে দেখে ততটা সাহসী মনে হয় না। কিন্তু আমি জানি, প্রয়োজন দেখা দিলে বন্ধুদের যে কারও জন্য তুমি প্রাণও দিতে পারবে।'

চুপ করে থাকল সৌরভ। এসব প্রশংসাবাণীর কোন জবাব হয় না।

'তোমার কখনও মনে হয় না তুমি এই পৃথিবীতে আগন্তুক? তুমি আসলে এখানকার কেউ নও?'

বোকার মত মেয়েটার দিকে তাকিয়ে থাকল ও। 'কেন? তা কেন মনে হবে?'

মৃদু হাসল টিরা। 'আমার কিন্তু প্রায়ই সেরকম মনে হয়। আগে যখন এখানে থাকতাম, তখন রুমভর্তি লোকজনের মধ্যে থাকলেও মনে হত আমি বুঝি একাই আছি। তবে এখন আর তা মনে হয় না। আমি কী বলতে চাইছি বুঝতে পারছ?'

'না,' মাথা নাড়ল সৌরভ। 'তোমার কথা শুনে আমার মাথার মধ্যে তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে।'

'টিরা, না?' আপনমনে বিড়-বিড় করে বলল ও। 'হ্যাঁ। এক সময় ওটাই ছিল আমার নাম। অনেক আগে। এখনও ওই নামেই কাজ চালাই। যখন দরকার হয়।'

'অনেক আগে মানে? কত আগে? কত বছর আগে?'

সাগরের দিকে ফিরল মেয়েটা। তটে ভেঙে পড়া ঢেউয়ের দিকে তাকিয়ে থাকল। 'অনেক আগে। আমার একটা অংশ নবীন। যেন এই সেদিন জন্মেছে। আরেকটার জন্ম হয়েছে

দেড়শো বছর আগে।'

হেসে উঠল সৌরভ। 'তুমি নিজেকে অবিনশ্বর প্রমাণ করতে চাইছ!'

টিরা হাসল না। 'আমি অসত্য কিছু প্রমাণ করতে "চাইছি" না। আমি সত্যি সত্যি অবিনশ্বর।'

হাসি থেমে গেল সৌরভের। এই প্রথমবারের মত খেয়াল করল, টিরাকে ঘিরে আলোর একটা হালকা বলয় রয়েছে। নীলচে আলোর বলয়। আগেরদিন লেকের কাছে দেখা বলগুলোর আলো যেমন ছিল, তেমনি।

'আজ তোমাকে অন্যরকম লাগছে,' চিন্তিত কণ্ঠে বলল ও।

'হ্যাঁ। আমি জানি।'

'কাল তুমি জানতে আলোর বলগুলো লেকের পারে দেখা দেবে?'

'হ্যাঁ।'

পরের প্রশ্ন কী হওয়া উচিত ভাবল সৌরভ। 'তুমি আসলে কোথাকার বলো তো? কক্সবাজারের?'

'হ্যাঁ। আবার না।'

ভুরু কুঁচকে উঠল সৌরভের। 'তার মানে কী হলো? তুমি এখানকার মেয়ে কি না, এক কথায় জবাব দেয়া যায় না?'

টিরা মাথা নাড়ল। 'না। কারণ শুধু "হ্যাঁ" বা "না" দিয়ে এর জবাব হয় না। ব্যাপারটা অনেক জটিল। সাদা ও কালোর। ভাল ও মন্দের।' এগিয়ে এসে ওর বুকে হাত রাখল মেয়েটা। 'দেখে যতটা মনে হয়, তারচেয়েও অনেক জটিল আমি।'

ওর হাতে অদৃশ্য এক শক্তি আছে, টের পেল সৌরভ। প্রতিটা আঙুলের মাথা দিয়ে যেন শক্তি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। পিছিয়ে যেতে চাইল ও, কিন্তু পারল না। এমনকী ওর চোখের উপর থেকে চোখ সরাতেও ব্যর্থ হলো।

টিরার চোখ দুটো অদ্ভুত, ভাবল ও। ঠাণ্ডা নক্ষত্রের আলোয় যমজ আয়নার মত জ্বল-জ্বল করছে মনে হলো।

'তুমি মানুষ তো!' প্রশ্নটা ভয়ে ভয়ে করল সৌরভ।

টিরার মুখে করুণ হাসি ফুটল। 'হ্যাঁ, মানুষ। আবার না। মানুষের চেয়েও বেশি কিছু আমি। আমি...আমি তোমাকে আমার সব কথা খুলে বলতে চাই।'

আবার পিছিয়ে যেতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো ও। কোনরকমে ডান হাত তুলে টিরার হাতটা সরিয়ে দিতে চাইল, তা-ও পারল না। হাতটাকে আর রক্ত-মাংসের হাত মনে হলো না সৌরভের। মনে হলো ওটা বুঝি অদ্ভুত কোন এনার্জির তৈরি। প্রতি মুহূর্তে তির-তির করে কাঁপছে।

'কেন?' গলা কেঁপে গেল সৌরভের। 'আমাকেই কেন?'

'কারণ তোমাকে আমার পছন্দ হয়েছে।'

ভয় পেয়ে গেল ও। 'পছন্দ হয়েছে মানে? কেন...?'

টিরার চোখ যেন ওকে দৃষ্টি দিয়ে জায়গায় গেঁথে ফেলল। গরম তার দিয়ে নিজের ও সৌরভের মগজের মধ্যে আজব এক ধরনের সংযোগ স্থাপন করে নিল ও।

'আমার সঙ্গে যোগ দেওয়ার উপযুক্ত করে নিতে,' টিরা বলল। 'আমার মত করে নিতে।'

নয়

রিসিভার রেখে চট করে উঠে পড়ল জ্যোতি। ব্যস্ত পায়ে বেরিয়ে এল বাসা থেকে।

রহস্যময় টিরা এবং রাজার উপর আলোর বলের আক্রমণের ব্যাপারে সারা আন্টির সঙ্গে কথা বলতে ঢাকায় ফোন করেছিল ও। তার সাহায্য প্রয়োজন।

কাজ হয়েছে। আন্টি ওকে কোন একটা জনহীন ফাঁকা জায়গায় গিয়ে অপেক্ষা করতে বলেছে। সে ওর সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা করে নেবে।

সারা আন্টির এরকম 'ব্যবস্থা' করে নেয়ার সঙ্গে মোটামুটি পরিচিত আছে জ্যোতি। ও জানে এসব তাঁর পক্ষে অসম্ভব কিছু নয়। ব্যাপারটা খুব বিস্ময়কর মনে হয় ওর।

খিলগাঁয়ে থাকে সারা আন্টি। কোন এককালে নাকি তার নাম ছিল সায়রা বেগম। এখন সেটা সারা হয়ে গেছে।

ঘোর রহস্যময় একটা চরিত্র।

বিশাল বাড়িতে একা থাকে। ওই এলাকায় সেটা ভূতুড়ে বাড়ি নামে পরিচিত। কেউ তাকে ডাইনী বলে, কেউ বলে বেদেনী। জাদু-টোনা আর ঝাড়ফুঁক খুব ভাল জানে মহিলা। কেউ এসব

ব্যাপারে সাহায্য চাইলে কখনও না করে না।

খিলগাঁ কবরস্থানে বেশ পুরানো একটা বাঁধানো কবর আছে। একটা গর্ত আছে সেটার পাশে। জ্যোতি জানে, গর্তটা তার 'সিক্রেট পাথ' বা গোপন পথ। ওই পথ দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে দুনিয়ার এক মাথা থেকে অন্য মাথায় চলে যেতে পারে সে। যাকে খুশি তাকে দূরে পাঠানো বা কাছে নিয়ে আসার 'ব্যবস্থা' করা, তা-ও পারে।

কাজের বিনিময়ে টাকা-পয়সা নেয় না আন্টি। শুধু কাজ উদ্ধারের জন্য যা-যা প্রয়োজন, কিনে দিতে হয়।

তার বয়স ত্রিশ না চল্লিশ না পঞ্চাশ, চেহারা দেখে বোঝার উপায় নেই। তবে ভোটাভুটির আয়োজন করা হলে শতকরা নব্বইজনই যে ত্রিশের পক্ষে ভোট দেবে, তাতেও সন্দেহ নেই।

বাসা থেকে বেরিয়ে সামনের ছোট মাঠটা পেরিয়ে এপারে চলে এল জ্যোতি। কিছু গাছপালার আড়ালে এসে এদিক-ওদিক তাকাল। নাহ্, কেউ দেখতে পাচ্ছে না ওকে। এবার আন্টির নির্দেশমত চোখ বুজল।

সঙ্গে সঙ্গে একটা টান অনুভব করল জ্যোতি। মনে হলো একজোড়া প্রচণ্ড শক্তিশালী হাতের টানে শূন্যে উঠে পড়েছে ও। একটা কালো ভেলভেটের সুড়ঙ্গ দিয়ে হু-হু করে পাতালের দিকে নেমে যেতে শুরু করেছে।

বড়জোর কয়েক মুহূর্ত স্থায়ী হলো অনুভূতিটা, তারপরই খাস ঢাকাইয়া বাংলা শুনে ওর চোখ চড়কগাছ হয়ে গেল। 'ওই খালি, মাদারট্যাক যাইবা নিকি?'

চট করে চোখ মেলল জ্যোতি। মহা বেকুব হয়ে গেল নিজেকে খিলগাঁ কবরস্থানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। কয়েকবার চোখ পিট-পিট করে ডানে-বাঁয়ে তাকাল

নাহ্! কোন ভুল নেই।

স্বপ্নও দেখছে না. খিলগাঁ কবরস্থানেই দাঁড়িয়ে আছে জ্যোতি। সীমানা দেয়ালের ওপাশে লোকজনের চলাফেরা দেখতে পাচ্ছে ও। রিকশা, সিএনজি স্কুটার চলছে. একটা বিরাট প্লেন সগর্জনে উড়ে গেল উপর দিয়ে।

ঘোর কাটতে পা বাড়াল ও। কবরস্থান থেকে বেরিয়ে বাঁ দিকে চলল। ওদিকে দু'শো গজমত গেলেই একটা সরু সুরকি বিছানো রাস্তা। সেটার মাথায় দাঁড়িয়ে আছে সারা আন্টির ভূতুড়ে বাড়ি। ওটাকে চারদিক থেকে বুনো গাছ আর জংলা লতা-পাতা এমনভাবে ঘিরে রেখেছে, দিনের বেলায়ও গা ছমছম করে ওর মধ্যে যেতে।

বাড়ির সামনের উঁচু রোয়াকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল সারা আন্টিকে। ছোট ছোট ফুলের প্রিন্টের সাদা সুতির ম্যাক্সি পরে আছে। কোমর পর্যন্ত দীর্ঘ, ঘন কালো চুলগুলো ভিজা।

দেখে মনে হয় এইমাত্র গোসল সেরে এসেছে। গলায় পুঁতির মত দেখতে বড় বড় কিছু দিয়ে তৈরি মালা।

কিছুক্ষণ চোখ কুঁচকে ওর দিকে তাকিয়ে থাকল সে, তারপর ইশারায় ভিতরে ডাকল।

ভিতরে নিয়ে বসতে বলল আন্টি. এই প্রথম এ বাড়ির ভিতরে ঢোকার সুযোগ হলো, তাই বসার ঘরটার উপর ভাল করে

চোখ বোলাতে লাগল জ্যোতি।

বাড়িটার বাইরের সঙ্গে ভিতরের অদ্ভুত অমিল দেখে যার পর নাই অবাক হলো। দামী, হাঁটতে গেলে গোড়ালি ডুবে যায় এমন পুরু কার্পেট, আরামদায়ক সোফা, ঝাড়বাতি, কোনকিছুরই অভাব নেই। একটা উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারের ড্রইং রুমে অতিথিদের নজর কাড়ার মত যা-যা থাকতে পারে, সবই আছে।

রুমের মাঝখানের খানিকটা জায়গা গাঢ় লাল ভেলভেটের পর্দা দিয়ে ঘিরে রাখা। সামান্য ফাঁক হয়ে আছে পর্দাটা। সেখান দিয়ে ভিতরে রাখা বড় একটা টেবিল দেখা যাচ্ছে। তার উপরে পূর্ণিমার চাঁদের মত গোল, ধপধপে সাদা রঙের বড় একটা বল দেখা যাচ্ছে। ক্রিস্ট্যাল বল হয়তো, জ্যোতি ভাবল।

'তুমি যে আলোর বলগুলোর কথা বললে, ওগুলো এ পৃথিবীর নয়,' সারা আন্টি বলল। একটু ফ্যাঁসফেঁসে গলা। 'ওগুলো অন্য কোন নক্ষত্রমণ্ডলী থেকে এসেছে।' কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল সে। 'তোমার বন্ধু রাজা এখন কঠিন বিপদে আছে।'

'না...!' ঢোঁক গিলল ও।

'কীভাবে কী ঘটেছে খুলে বলো।'

মাথা দোলাল জ্যোতি। 'বলছি!' গতকাল দুপুরের পর ওদের লেকের পারে বেড়াতে যাওয়া থেকে শুরু করে সেখানে বলের উপস্থিত হওয়া, রাজার আক্রান্ত হওয়া, ইত্যাদি সবকিছু সারা আন্টিকে খুলে বলল ও।

শুনে কিছুক্ষণ গালে হাত দিয়ে কার্পেটের দিকে তাকিয়ে বসে থাকল সে। তারপর চোখ বুজে এক হাত কপালে রেখে বসল।

শ্বাস নিতে লাগল ঘন ঘন।

'তোমরা কতজন ছিলে লেকের পারে?'

'আমি, রাজা, সৌরভ, ইমরান, উপম, উর্মি আপু, তিয়ানা। আর টিরা নামের নতুন একটা মেয়ে। আমাদের সবার ধারণা, এই মেয়েটাই সবকিছুর মূলে আছে।'

'যেমন?'

বলগুলোর ব্যাপারে টিরার সবকিছু জানা থাকা, সময়মত নির্ভয়ে হাত তুলে সেগুলোকে আহ্বান জানানো ইত্যাদির কথাও জানাল জ্যোতি।

এইবার চোখ মেলে তাকাল সারা আন্টি। 'কী নাম বললে মেয়েটার? টিরা, না? ও-ই নষ্টের মূল। তবে সে জন্য ওকে দোষ দেওয়া যায় না। কারণ মেয়েটা নিজের ইচ্ছায় কিছু করেনি। ও অন্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে।'

'হতে পারে,' মাথা ঝাঁকাল জ্যাতি। 'ওর কথাবার্তা, কাজকর্ম, সব যেন কেমন কেমন লেগেছে আমাদের। অনেক বছর আগে নাকি মা-বাবার সঙ্গে কক্সবাজারে বেড়াতে গিয়েছিল ও। আপনি চেনেন মেয়েটাকে?'

কিছুক্ষণ সিলিঙের দিকে তাকিয়ে থাকল সারা আন্টি। 'খুব সম্ভব চিনি,' বলে কিছু ভাবল। 'আমার দাদীর দাদীর একটা ডায়রি ছিল। সেটায় টিরার নামটা সম্ভবত দেখেছি আমি। অনেকদিন আগের কথা, অল্প অল্প মনে আছে। ভেবো না, সব জেনে নেওয়া যাবে। তুমি একটু বোসো। আমি আসছি।'

পর্দা ঢাকা জায়গাটুকুর মধ্যে গিয়ে পর্দা টেনে ফাঁকটা বুজে

দিল আন্টি। চেয়ারের মৃদু ক্যাঁচকোঁচ শব্দ হলো। তারপর বিড়-বিড় করে কী সব বলতে লাগল আন্টি।

'তোমার সঙ্গীরা সবাই এখন কোথায়?' একটু পর জানতে চাইল সে।

বলের আক্রমণের পর ওর আচরণ কেমন ছিল, সে সম্পর্কে আন্টিকে জানাল ও। তারপর বলল, 'আজ সকাল থেকে ও খুব রহস্যজনক আচরণ করছে, আন্টি। তাই...'

'কীরকম রহস্যজনক আচরণ?' বাধা দিয়ে প্রশ্ন করল সারা আন্টি।

'সকালে একবার দেখলাম গভীর ঘুমে বেহুঁশ। আবার তার একটু পর দেখি বাড়িতেই নেই। আবার কিছুক্ষণ পর কোত্থেকে এসে বলল, শরীর ভাল লাগছে না। তাই আবার কিছুক্ষণ ঘুমাবে।'

'হুঁম! তারপর?'

'তারপর আবার উধাও হয়ে গেল। তাই আপনাকে ফোন করার আগে বাকি সবাইকে পাঠিয়েছি রাজা আর টিরাকে খুঁজে বের করতে। আমিও যেতাম। আপনার...'

'তাই দেখছি!' নিচু কণ্ঠে বলল সারা আন্টি।

'কী বললেন?'

'মেয়েরা কঠিন বিপদে আছে। ঊর্মি আর তিয়ানা। সৌরভও বিপদে পড়তে যাচ্ছে।'

শিরদাঁড়া সোজা হয়ে গেল জ্যোতির। পর্দার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কী ধরনের বিপদ, আন্টি! ওদেরকে সাহায্য করতে যেতে

হবে!'

'মেয়েরা লেকের পারে আছে,' বলতে গিয়ে গলা কেঁপে গেল আন্টির। 'রাজা আক্রমণ করেছে ওদেরকে।' কিছু সময়ের নীরবতা। 'লাভ নেই। এখন কারও কোন সাহায্য ওদের কাজে আসবে না। পরিণতি যা হওয়ার, তা হবেই।'

'আপনি ঠিক জানেন, ওদেরকে সাহায্য করার কোন উপায় নেই! উর্মি আপু আর তিয়ানার কিছু হয়ে গেলে...'

'জানি। কিন্তু তুমি চাইলেও সময়মত ওখানে পৌঁছতে পারবে না। তবে এনিয়ে চিন্তার বিশেষ কিছু নেই। মেয়ে দু'টো যথেষ্ট সাহসী এবং সমঝদার। ওরা নিজেরাই নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারবে।'

'যদি না পারে?'

এক মুহূর্ত নীরব থাকল সারা আন্টি। তারপর ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। 'তা হলে ওরাও বদলে যাবে।'

একদৃষ্টে পর্দার দিকে তাকিয়ে থাকল জ্যোতি। 'আলোর বলগুলো? ওগুলো কি ফিরে এসেছে?'

'হ্যাঁ, ফিরে এসেছে,' কথাটা যেন অনেক দূর থেকে বলল সারা আন্টি।

'ওগুলো কীসের বল? কী আছে ওর মধ্যে?'

'অশুভ আত্মা আছে। বাইরের কোন গ্রহ থেকে পালিয়ে আসা কিছু অশুভ আত্মা।'

মাথা নাড়ল জ্যোতি।

আবার কিছু সময় চুপ করে থাকল আন্টি। মনে মনে কথা

গুছিয়ে নিল বোধহয়। 'প্রায় দেড়শো বছর আগে, শত্রুপক্ষের তাড়া খেয়ে অন্য কোন ছায়াপথ থেকে পৃথিবীতে পালিয়ে এসেছিল কিছু আত্মা। এখানে নিজেদের মত করে বাঁচতে চেয়েছিল। কিন্তু দলের মধ্য থেকে কেউ বিশ্বাঘাতকতা করে বসায় শত্রুপক্ষ জেনে যায় ওগুলোর অবস্থানের কথা। পৃথিবীতে চলে আসে তারা। ওগুলোকে বলের মধ্যে বন্দি করে রেখে যায়। বলে যায়, মানুষের রূপ নিতে পারলে স্বাধীনভাবে বাঁচতে পারবে আত্মারা, নয়তো বলের মধ্যেই বন্দি থাকতে হবে অনন্তকাল। আবার বলগুলোর বিচরণের ক্ষেত্রও একটা লেকের আশেপাশের সামান্য জায়গার মধ্যে সীমিত করে দিয়ে গেছে তারা। যাতে ওর মধ্যে কখনও মানুষ গেলে তার ভিতরে ঢোকার সুযোগ পায় ওগুলো, ইচ্ছেমত ঘুরেফিরে শিকার ধরার সুযোগ না পায়। সেগুলোর একটা প্রথম সুযোগেই টিরা নামের মেয়েটার মধ্যে ঢুকেছে দেড়শো বছর আগে। আরেকটা কাল রাজার মধ্যে ঢুকেছে।'

অজান্তেই মুঠো পাকিয়ে ফেলল জ্যোতি। দুশ্চিন্তায় ঘাম ছুটে গেল। 'তা হলে এখন কী হবে? এই বিপদের হাত থেকে বাঁচার উপায় কী?'

আড়াল থেকে বেরিয়ে এল সারা আন্টি। সোফায় ওর মুখোমুখি বসল। দুর্লভ হাসি দেখা গেল তার ঠোঁটের কোণে। মহিলাকে সাধারণত হাসতে দেখা যায় না।

'তোমার নার্ভ আছে! বন্ধুদের জন্য প্রচণ্ড ভালবাসাও আছে। বলো তোমাকে আমি কী সাহায্য করতে পারি।'

'আপনি তা জানেন, আন্টি।'

দ্রুত মাথা ঝাঁকাল সে। 'তবু তোমার নিজের মুখ থেকে শুনতে চাই।'

'আপনি মাইন্ড রিডিং জানেন?'

'হ্যাঁ। কাজটা খুব সহজ। নিজের মনটাকে স্তব্ধ রেখে অন্যদের মনের কথা শোনার চেষ্টা করলেই মাইন্ড রিডিং করা সম্ভব। কিন্তু এখন ওসব থাক। এটা টেলিপ্যাথির সময় নয়।'

'আমারও তাই মনে হয়,' বলে কিছু ভাবল ও। 'আপনি ঠিক জানেন, আমি কোনও সাহায্য করতে পারব না ঊর্মি আপু আর তিয়ানাকে? ওদের খারাপ কিছু ঘটে যাবে, ভাবতেই পারি না।'

'আমি তো আগেই বলেছি, তুমি সময়মত ওদেরকে সাহায্য করার সুযোগ পাবে না। দেরি হয়ে যাবে। কিন্তু তা নিয়ে তোমার দুশ্চিন্তা করারও খুব একটা প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। মেয়ে দুটো যথেষ্ট সাহসী। নিজেদেরকে রক্ষা করার মত যথেষ্ট বুদ্ধিও রাখে।'

'কিন্তু "যদি" না পারে?'

কাঁধ ঝাঁকাল সারা আন্টি। 'যদি না পারে, তা হলে কী হবে সে তো আগেই বলেছি।'

হেলান দিয়ে বসল জ্যোতি। অস্থির লাগছে। 'বলগুলো এই সময়ই হাজির হলো কেন বলতে পারেন?'

'না। হয়তো টিরা বলতে পারবে।'

হাত মুঠো পাকিয়ে ফেলল ও। 'ঊর্মি আপুই ঠিক। কাল ও সন্দেহ করেছিল মেয়েটাকে। কিন্তু আমরা গায়ে মাখিনি ওর

কথা। ভেবেছি, ও নতুন কাউকে দেখলেই সব সময় সন্দেহ করে। বিশেষ করে টাঙ্গাইলের সেই ঘটনার পর থেকে। আমি জানি, ওই মেয়েটাই...'

'শুধু শুধু মেয়েটাকে দায়ী করছ তুমি, জ্যোতি। বলেছি তো, ও ওর নিজের ইচ্ছায় চলে না। অন্য কিছুর নির্দেশে চলে।'

দশ

পরাজয় স্বীকার করে নেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকল না ঊর্মিদের। একটা পাথরও লাগল না রাজার গায়ে। ঊর্মির লক্ষ্য নির্ধারণে ভুল ছিল বলে নয়। রাজা বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে বলে।

ওর কয়েক হাত দূরে থাকতেই একে একে শূন্যে বিস্ফোরিত হলো পাথরগুলো। দেখতে দেখতে মজুত ফুরিয়ে গেল, তবু একটাও লাগানো গেল না ওর গায়ে।

ফল যা হওয়ার তাই হলো, কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ওদেরকে ধরে ফেলল রাজা। ওর সাইকেলের ক্যারিয়ারে কিছু দড়ি ছিল, সেটুকু দিয়ে পাশাপাশি দুটো গাছের সঙ্গে মজবুত করে বেঁধে ফেলল ঊর্মি ও তিয়ানাকে।

রাজার কবল থেকে ছাড়া পাওয়ার কম চেষ্টা করেনি মেয়ে

দুটো। কিন্তু মনে হলো যেন দশটা রাজার শক্তি ভর করেছে ওর দেহে। সুপারম্যান হয়ে গেছে ও।

ওভাবে কাজ না হওয়ায় কৌশলের আশ্রয় নিল ঊর্মি। ওকে কথায় ভোলাতে চেষ্টা করল।

'শোন! আমরা সবাই ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আমাদের সঙ্গে তোর এরকম আচরণ করা ঠিক হচ্ছে না। আলোর বলগুলো এসে পড়ার আগেই বাঁধন খুলে দে আমাদের। কাল ওগুলোর একটা তোকে ছুঁয়ে দিতে কী অবস্থা হয়েছিল তোর মনে নেই? তুই জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলি। তারপর থেকে তুই বদলে গেছিস। সেই বল এখন তোকে নিয়ন্ত্রণ করছে। তোকে বুঝতে হবে ওটা আজেবাজে কাজ করিয়ে নিচ্ছে তোকে দিয়ে।'

মাথা নাড়ল রাজা। চোখ জ্বল-জ্বল করছে। 'আগে তোদেরকে বুঝতে হবে, বলের শক্তি তোদের মধ্যে ঢুকিয়ে তোদের উপকার করছি আমি। কাজটা হলেই তোদের দু'জনের জনম সার্থক হবে।'

'কিন্তু আমরা সে সার্থকতা চাই না,' তিয়ানা বলল। 'আমরা যা আছি, তাই থাকতে চাই।'

বিচ্ছিরিভাবে হাসল রাজা। 'এই একটা ব্যাপারে তোদের মতামতের কোন দাম নেই। দোয়া কর, যেন যারা তোদের মধ্যে ঢুকবে, তারা বেশি লোভী না হয়। তোদের সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব যেন না খেয়ে ফেলে।'

চেহারা করুণ হয়ে উঠল তিয়ানার। 'তোর সবটা খাওয়া হয়ে গেছে, রাজা?'

নামটা শুনে মনে হলো একটা ঝাঁকি খেল ও। কিন্তু পরক্ষণে নিজেকে সামলে নিল রাজা...বা ভিতরের জিনিসটা। নাক দিয়ে বিচ্ছিরি আওয়াজ করল।

'আমি রাজা নই!' অদ্ভুত গলায় বলল ও। 'আমি এখন যে ক্ষমতার অধিকারী হয়েছি, তার কথা রাজা ভাবতেই পারবে না।'

'ক্ষমতা বেড়েছে ভাল কথা,' ঊর্মি বলল। 'কিন্তু রাজার মধ্যে যে দয়া-মায়া ছিল, তা তো বাড়েনি!'

হা-হা করে হাসল রাজা। 'যা খুশি ভাবতে পারিস। দয়া-মায়া হচ্ছে মূল্যহীন। তোদেরকে ছেড়ে দেয়া সম্ভব না। হয় তোরা আমার মত হয়ে যাবি, নয়তো মৃত্যু।'

'আমি প্রয়োজনে মরব!' ঊর্মি বলল দৃঢ়কণ্ঠে। 'তবু তোর...'

কথা শেষ হওয়ার আগেই চট করে ওর সামনে এসে দাঁড়াল রাজা। চোখ লক্ষ্য করে তর্জনী তুলল। ওর প্রতিটা আঙুলের মাথা থেকে মনে হলো আগুনের ফুলকি বের হচ্ছে। হাসিটা ভয়ঙ্কর লাগছে।

একটু ঝুঁকে ভুতুড়ে গলায় বলতে লাগল, 'এখন যদি আমি তোর কানে আঙুল রাখি, তোর মগজ গলে যাবে। ভয়ঙ্কর কষ্টের মৃত্যু হবে তোর। তুই যন্ত্রণায় এত জোরে চিৎকার করবি, যা শহর থেকেও শোনা যাবে।'

রেগেমেগে ওর মুখে থুতু মারল ঊর্মি। 'যা, ভাগ! তোর ওইসব হুমকিতে আমি ঘাবড়াই না। আর তোর মত জানোয়ারের সামনে চিৎকার করার তো প্রশ্নই আসে না। আমার চিৎকার শুনে তুই তৃপ্তি পাবি ভেবেছিস? তা কোনদিনও হবে না।'

'উর্মি আপু!' তিয়ানার গলা কেঁপে গেল। 'ওকে ক্ষেপিয়ে তোলা ঠিক হচ্ছে না। এখন ওর ক্ষমতা অনেক। আমরা সুবিধে করতে পারব না। তা ছাড়া তুই নিশ্চয়ই চাস না তোর মগজ সত্যি সত্যি গলে পড়ুক! কী বিচ্ছিরি মৃত্যু, ভেবে দেখেছিস?'

রাজা তখনও আগের মত উর্মির উপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে। 'কী করবি তোরা, ঠিক করেছিস? মরবি, না আমার মত অমর হবি? তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নে।'

উর্মিকে আগ্রহী হয়ে উঠতে দেখা গেল। 'তোর মত নীচ মানসিকতার না হয়ে যদি অমর হওয়া যায়, তা হলে আমি অমর হতে রাজি।'

বিকট আওয়াজ করে উল্লাস প্রকাশ করল রাজার ভিতরের জিনিসটা। বলল, 'আমাদের মধ্যে যেটা সবচেয়ে বেশি বদরাগী, সেটাকেই তোর মধ্যে ঢোকানো হবে। যাতে তোর দেমাগ খেয়ে ফেলে ওটা।'

হাত তুলে অগ্রসরমান আলোর বলগুলো দেখাল রাজা। 'ওই আসছে। আর বেশিক্ষণ মানুষ থাকবি না তোরা। আমি গেলাম। অনেক কাজ পড়ে আছে,' ঘুরে দাঁড়াল ও।

'রাজা!' তিয়ানার কণ্ঠে আতঙ্কের আভাস পাওয়া গেল। 'চলে যাস না! ওগুলোকে ঠেকা। যেন কিছুতেই আমাদের কাছে আসতে না পারে। যাস না, রাজা।'

কয়েক পা সরে গিয়ে ঘুরল ওটা। মুখ বাঁকিয়ে হাসল। 'রাজা? রাজা মরে গেছে।'

অবাক বিস্ময়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধুটির দিকে তাকিয়ে থাকল তিয়ানা ও

উর্মি। ওদের দিকে আর একবারও না তাকিয়ে ধীর পায়ে নিজের সাইকেলের কাছে গিয়ে দাঁড়াল রাজা। ওটা তুলে নিয়ে শহরের দিকে রওনা হলো।

আলোর বলগুলো তখন ওদের কাছ থেকে পঞ্চাশ-ষাট গজ দূরে রয়েছে। অব্যাহত গতিতে ধীরে ধীরে উর্মি-তিয়ানার দিকে এগিয়ে আসছে। কম করেও বিশটা বল। এমনভাবে আসছে, যেন তাজা রক্তের গন্ধ পেয়েছে।

মরিয়া হয়ে হাতের বাঁধন খোলার চেষ্টা করতে লাগল ওরা। কিন্তু একচুল আলগা হলো না বাঁধন, বরং আরও চেপে বসতে লাগল। হাজার চেষ্টা করলেও ছাড়া পাওয়া যাবে না বুঝতে পেরে অবশেষে হাল ছেড়ে দিল দুই কিশোরী। নীরবে নিয়তিকে মেনে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হলো।

হাঁপিয়ে উঠেছিল তিয়ানা। একটু জিরিয়ে নিয়ে বলল, 'রাজার আচরণের কী অদ্ভুত পরিবর্তন হয়েছে, না রে!'

'হ্যাঁ,' রাজার গমনপথের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল উর্মি। 'বিশ্বাস হতে চায় না।'

তিয়ানাও দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। 'আমার জন্য তোর ফিরে আসাটা ঠিক হয়নি, উর্মি আপু! তোর বরং ফিরে গিয়ে সবাইকে খবর দেওয়া উচিত ছিল।'

'আমারও তাই মনে হচ্ছে এখন। ভুল হয়ে গেছে। ওদেরকে খবর দিলে এতক্ষণে হয়তো...'

বলগুলোর উজ্জ্বলতা একটু একটু করে বাড়ছে লক্ষ করল ওরা। যেন মজাদার কোন খাবারের দেখা পেয়ে খুশি হয়ে উঠেছে

বহুদিনের অভুক্ত জিনিসগুলো।

আর মাত্র ত্রিশ গজ দূরে আছে। এগিয়ে আসছে।

'এখন কী করব আমরা?' তিয়ানার গলার স্বর মনে হলো কিছুটা কেঁপে গেল।

'তোর মাথায় কোন বুদ্ধি থাকলে বল।'

একটু ভাবল তিয়ানা। 'ওগুলোকে ভয় দেখিয়ে ভাগিয়ে দেওয়া যায় না?'

'মনে হয় না,' মাথা নাড়ল ঊর্মি। 'আমাদের চেহারায় কাউকে ভয় দেখানোর মত কোন আলামত আছে?'

'আচ্ছা, ঊর্মি আপু! ওগুলোর একটা ভেতরে ঢুকলে কেমন লাগবে মনে হয় তোর?'

'আগে ঢুকে নিক,' খাট্টা মেজাজে জবাব দিল ও। 'তারপর কেমন লাগে বুঝে নিয়ে তোকে জানাব।'

চোখ বড় বড় করে তাকাল তিয়ানা। 'আশ্চর্য! এরমধ্যেও তোর ঠাট্টা! আমি ভয়ে বাঁচি না, আর তুই...'

'আমিও তো ভয়ে বাঁচি না!' ঊর্মি বলল ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে। 'তুই জানিস না, আমি ভয় পেলে দুনিয়ার যত ফালতু কৌতুক বলি?'

তিয়ানাকে চিন্তিত মনে হলো। 'রাজা তখন ''আমাদের মধ্যে যেটা সবচেয়ে বেশি বদরাগী, সেটাকে তোর মধ্যে ঢোকানো হবে, যাতে তোর দেমাগ খেয়ে ফেলে'' বলছিল কেন? তার মানে কি বলগুলো একেকটা আলাদা সত্তা?'

'হবে হয়তো,' ঊর্মি ঠোঁট উল্টাল। 'এখন আর ওসব নিয়ে

ভাবছি না আমি।'

আর মাত্র পনেরো গজ দূরে আছে বলগুলো, মাটি থেকে দশ-বারো হাত উপরে ভাসছে। ওগুলোর ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছে, কোন্‌টা ওদের কাছে আগে পৌঁছবে তাই নিয়ে রীতিমত ঠেলাঠেলি চলছে। তিয়ানা আবার হাত খোলার চেষ্টায় লাগল। কিন্তু ব্যর্থ চেষ্টা। কোন লাভ হলো না।

'ঊর্মি আপু! ওগুলো পৌঁছার আগে আমাদেরকে মুক্ত হতেই হবে। না হলে...'

'ইস! এখন যদি একটা ছুরি থাকত!'

হঠাৎ আশার আলো ফুটল তিয়ানার চেহারায়। 'এই! তোর বিক লাইটারটা কোথায়, আপু? ওটা না সব সময় তোর পকেটে থাকে?'

ঊর্মির চেহারাও জ্বলে উঠল। 'আরে, তাই তো! আজও আছে, আমার ব্যাক পকেটে। দেখলি, একদম ভুলে গিয়েছিলাম! ওটা জ্বেলে সহজেই দড়ি পুড়িয়ে দিতে পারব আমি।' ব্যাক পকেটে হাত ঢোকানোর জন্য মোড়ামুড়ি শুরু করে দিল ও। 'ওটাকে বের করতে পারলে হয় এখন।'

একটা বল নীচের দিকে নামতে শুরু করেছে দেখে তিয়ানার হার্টবিট বেড়ে গেল। একটু পর যখন বোঝা গেল বলটা সরাসরি ওর মাথা লক্ষ্য করেই আসছে, তখন চেঁচিয়ে উঠল, 'ঊর্মি আপু! জলদি কর! ওই আসছে!'

রাজা ওদের হাত গাছের পিছনে নিয়ে বেঁধেছে। গাছগুলো বেশি চওড়া নয়, সরু। তাতে বরং সুবিধাই হলো, অনেক সহজে

হিপ পকেট থেকে লাইটারটা বের করে ফেলতে পারল উর্মি। সাবধানে ধরে দড়ি পোড়াবার চেষ্টা করল।

কিন্তু না দেখে কাজ করতে হচ্ছে বলে হাতে আগুনের ছ্যাঁকা লেগে গেল। যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল উর্মি।

'লাইটার ফেলে দিয়েছিস নাকি!' তিয়ানাও পাল্টা চেঁচাল।

'না। আমার হাত পুড়ে গেছে।'

স্বস্তি ফুটল তিয়ানার চেহারায়। 'ও কিছু না। বাঁচতে পারলে একদিন সেরে যাবে। এখন দড়ি পোড়ানোর ব্যবস্থা কর।'

উর্মির আঁতে ঘা লাগল। 'আঙুল পুড়ে গেল বলে কোথায় একটু সান্ত্বনা দিবি, তা না, উল্টে খোঁচা মারছিস!'

'আরে, গোল্লায় যাক তোর আঙুল! আমি আমার আত্মা নিয়ে মহা দুশ্চিন্তায় আছি,' উপরে তাকাল তিয়ানা। সবচেয়ে কাছের বলটা আর মাত্র পাঁচ গজ দূরে আছে এখন। ক্ষুধার্ত হায়েনার মত ব্যগ্র লাগছে ওটাকে। 'জলদি কর!'

'থাম তো! আমি কি বসে আছি নাকি?' আরও কিছু সময় দড়িতে আগুন ধরাবার চেষ্টা করল উর্মি। তারপর থেমে বাতাস শুঁকল। 'ধোঁয়ার গন্ধ পাচ্ছি!'

তিয়ানা খুশি হয়ে উঠল। 'ওই তো আগুন লেগেছে! থামিস না! তাড়াতাড়ি...'

কিন্তু ও তিয়ানার মত খুশি হতে পারল না। পিছনদিকটা দেখার মরিয়া চেষ্টা করতে লাগল। 'তিয়ানা, দেখ তো! গাছে আগুন ধরে গেল কি না!'

গাছের ওপাশটা দেখার চেষ্টা করল তিয়ানা, কিন্তু পারল না।

কেবল কমলা রঙের শিখা চোখে পড়ল। উর্মির হাতের অবস্থানের কিছুটা উপরে। উপরেরদিকে উঠছে শিখাটা।

তার মানে, গাছেই আগুন লাগিয়ে দিয়েছে উর্মি।

'হ্যা, তাই হয়েছে, উর্মি আপু!' তিয়ানার গলায় হতাশা। 'গাছের ছাল পুড়ছে। কিন্তু তোর ভয় পাওয়ার কিছু নেই। এখনই পুড়ে মরবি না তুই। চেষ্টা কর, চেষ্টা কর!'

'কিন্তু যদি পুরো গাছে আগুন ধরে যায়! তার আগেই নিজেকে মুক্ত করতে না পারলে তো...'

বলতে বলতে আবার লাইটার নিয়ে ধস্তাধস্তি শুরু করে দিল উর্মি। ওদিকে বলটা আরও অনেক এগিয়ে আসায় তিয়ানা রীতিমত লাফঝাঁপ শুরু করে দিয়েছে 'এসে গেছে, উর্মি আপু! এসে গেছে! এখনই আমাকে...'

'চুপ কর!' উর্মি আতঙ্কিত হয়ে উঠল গাছ গরম হয়ে উঠতে শুরু করেছে টের পেয়ে। 'আমার চুলে আগুন ধরে যাবে যে কোন সময়।'

সবচেয়ে কাছের বলটা তিয়ানার মাথার মাত্র তিন গজের মধ্যে এসে পড়েছে। সব ভুলে ওটার দিকে সম্মোহিতের মত তাকিয়ে আছে তিয়ানা। আতঙ্কে চিকন ঘাম ফুটেছে ওর কপালে। মুখ দিয়ে কথা বের হচ্ছে না। ওটা যদি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারও হত, তবু বোধহয় এত ভয় পেত না ও।

ওদিকে গাছে ধরে যাওয়া আগুনের শিখা আরও লম্বা হয়ে উঠেছে। শুকনো ছাল-বাকল পোড়ার মৃদু চড়চড় শব্দ উঠছে। উর্মির মাথার উপরের কয়েকটা ছোট ছোট ডালে আগুন ধরে

গেছে। ঘন ধোঁয়ায় ভরে গেছে অনেকখানি জায়গা।

ভাসমান বলগুলোর দিকেও যাচ্ছে ধোঁয়া, কিন্তু তাতে ওগুলোর কোন প্রতিক্রিয়া হলো না।

সবচেয়ে কাছের বলটা তিয়ানার মাথার এক গজের মধ্যে পৌঁছে গেছে। স্পষ্ট টের পাওয়া যাচ্ছে ওটার ভিতর থেকে রেডিয়ামের মত জ্বলজ্বলে এনার্জি বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে। এক ধরনের অস্বস্তিকর বৈদ্যুতিক চার্জ–যার কারণে ওর চুল দাঁড়িয়ে যেতে শুরু করেছে।

হাল প্রায় ছেড়ে দিয়েছে তিয়ানা, নিজেকে নিয়তির হাতে সমর্পণ করতে যাচ্ছে, এমন সময় হাতের বাঁধন খুলে ফেলল ঊর্মি। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে তিয়ানার পাশে এসে ওর বাঁধনও খুলে দিল। কিন্তু বলটা তখন একেবারে ওদের মুখের উপরে এসে পড়েছে। ঊর্মির কিছু করতে সাহস হলো না।

তাড়িয়ে দিতে গেলে যদি আক্রমণ করে বসে?

সে চেষ্টা না করে তিয়ানাকে নিয়ে তীরবেগে লেকের দিকে ছুটল ও। সেখান থেকে সাইকেল নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা।

মাটি থেকে সাইকেল তুলে নিল ওরা, তখনই আলোর বলের দ্বিতীয় ঢেউটার উপর চোখ পড়ল। পাহাড়ের চূড়া অতিক্রম করে এপাশে চলে এসেছে।

এটায় বলের পরিমাণ আরও অনেক, অনেক বেশি।

ভয়ে, আতঙ্কে জায়গায় জমে গেল ওরা।

'সর্বনাশ!' তিয়ানা বলল কোনমতে। 'হাজার হাজার বল!'

মাথা দোলাল ঊর্মি। 'মনে হচ্ছে কক্সবাজারের সবার জন্য

একটা করে বল বরাদ্দ করা হয়েছে। কপাল ভাল যে ওগুলো দ্রুতগতিতে চলতে পারে না। অন্তত লোকজন সতর্ক হওয়ার সময় পাবে।'

'রাজা মনে হয় এই জন্যেই আমাদেরকে আগেভাগে নিজের দলে অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিল,' তিয়ানা বলল। 'নিজের দল ভারী করার জন্য। যাতে লোকজন ধরা-বাঁধার কাজে আমরাও ওকে সাহায্য করতে পারি, আর বলের ভিতরের আত্মাগুলো ঢুকে যেতে পারে তাদের মধ্যে। আজ মনে হয় শহরের সবাইকে দলে ভিড়িয়ে নেয়ার ইচ্ছা আছে রাজার। তাই সবগুলো বল একসঙ্গে এসে হাজির হয়েছে।'

ওকে যে গাছে বেঁধে রাখা হয়েছিল, সেটার দিকে তাকাল ঊর্মি। প্রায় পুরো পুড়ে গেছে ওটা, আগুন বেড়ে গেছে বহুগুণ। তেমনি বেড়েছে উত্তাপ আর ধোঁয়া। কিন্তু তাতে বলগুলোর মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া হলো না। আগুন এড়ানোর কোন চেষ্টাই নেই ওগুলোর মধ্যে।

'মনে হচ্ছে আগুনে কিছু হয় না,' ঊর্মি বলল চিন্তিত মনে। 'তা হলে কী দিয়ে খতম করা যায় ওগুলোকে?'

'আদৌ খতম করা যায় কি না, আমি তাই ভাবছি,' তিয়ানা বলল।

এগারো

সৌরভ আর টিরা লেক-পারের সেই বিশেষ পাহাড়ের চূড়ায় এসে উঠল। সৌরভের আসার কোন ইচ্ছা ছিল না, তারপরও যে কেন এল, নিজেই ভেবে পাচ্ছে না।

মাথা একটু একটু ঘুরছে সৌরভের। নিজেকে সান্ত্বনা দিচ্ছে, নিশ্চয়ই মেয়েটাকে বুঝতে ওর কোন ভুল হয়েছে। ও যা ভাবছে টিরা আসলে তা বলেনি। হয় তাকে ভুল বুঝেছে ও, নয়তো মেয়েটা ওর সঙ্গে ঠাট্টা করেছে।

হঠাৎ ওর দিকে ফিরে তাকাল টিরা। এখন আর আগের মত জ্বল-জ্বল করছে না ওর চোখ। সুন্দর, মায়াভরা দুটো চোখ।

'আরও কিছু জানতে চাও?' চোখাচোখি হতে প্রশ্ন করল টিরা। 'থাকলে প্রশ্ন করো। আমি তোমাকে মিথ্যে বলব না।'

'তোমার বয়স কত?'

'তোমার কত মনে হয়?' পাল্টা প্রশ্ন করল মেয়েটা।

'তেরো কি চোদ্দ।'

টিরার চেহারা দেখে মনে হলো অবাক হয়েছে। 'আমার বয়স যখন চোদ্দ, তখন থেকে বয়স বাড়া থেমে গেছে। দেড়শো বছর আগে থেকে।'

চোখ বড় বড় করে তাকাল সৌরভ। 'কী বলছ! তুমি অমরত্ব পেয়েছ নাকি?' মেয়েটার মস্তিষ্কের সুস্থতা নিয়ে সন্দেহ জাগল ওর মনে।

'ঠিক ধরেছ। ইচ্ছে করলে তুমিও তা পেতে পারো।'

এক হাত তুলল সৌরভ। 'থামো, থামো! এসব কী বলছ তুমি, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। আবার প্রথম থেকে সব বলো দেখি!'

কিছু সময় ভাবল টিরা। 'শুনবে? শোনো তা হলে। আমি যখন ক্লাস এইটে পড়ি, তখন মা-বাবার সঙ্গে কক্সবাজারে বেড়াতে এসেছিলাম। একদিন বিকেলে ঘুরতে ঘুরতে এই পাহাড়ে উঠলাম। একটু পর কীভাবে কী ঘটল মনে নেই, হঠাৎ পিছন থেকে একটা ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেলাম আমি। তারপর...তারপর কী যে হলো, ঠিক বলতে পারব না। আমি বদলে গেলাম।'

'কীরকম বদলে গেলে?'

শ্রাগ করল মেয়েটা। 'জীবনটাই অন্যরকম হয়ে গেল। মনে হতে লাগল, আমি ইচ্ছে করলেই বুঝি তারাদের রাজ্যে চলে যেতে পারি। অতীতে বা ভবিষ্যতে চলে যেতে পারি।' দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। 'এখন আমি সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী। যেখানে খুশি, যখন খুশি যেতে পারি। আর কখনও আমার বয়স বাড়বে না। কখনও মৃত্যু হবে না আমার।'

সৌরভের কাঁধে হাত রাখল টিরা। 'কত মজার জীবন আমার, ভেবে দেখেছ? তোমার লোভ হয় না আমার মত হতে?'

সৌরভ কী জবাব দেবে ভেবে পেল না। অবাস্তব, অসম্ভব

মনে হচ্ছে টিরার কাহিনী। তারপরও কীভাবে যেন মন থেকে বুঝতে পারল, মিথ্যে কিছু বলছে না মেয়েটা।

'কিন্তু কী ঢুকেছে তোমার মধ্যে?' জিজ্ঞেস করল ও। 'জিনিসটা কী?'

মাথা নাড়ল টিরা। 'বর্ণনা করার উপায় নেই। তার দরকারও নেই। জিনিসটা যে ভাল, তা আমাকে দেখেই তো বুঝতে পারছ তুমি।'

'কিন্তু আলোর বলগুলো আসে কোত্থেকে? কাল কোত্থেকে এসেছিল ওগুলো?'

'এদিকেই কোথাও থাকে ওগুলো,' শ্রাগ করল ও। 'কিন্তু কোথায় তা বলতে পারব না।'

'কাল ওগুলোর একটা রাজার মধ্যে ঢোকার পর থেকে ও অদ্ভুত আচরণ করছে। এখন আর আগের মত নেই ও।'

'নেই তাতে হয়েছে কী? সবে না নতুন জীবন শুরু হলো রাজার। কিছুদিন সময় দাও, সব ঠিক হয়ে যাবে। তবে ওর ভিতরে যেটা ঢুকেছে, সেটা একটু নির্দয় ধরনের। কিন্তু আমাদের সবাই কি আর সেরকম? আমাদের মধ্যেও দয়া-মায়া আছে। তোমাকে তা বুঝতে হবে, সৌরভ।'

'তুমি চাও আমি তোমাদের দলে যোগ দিই?' সৌরভ বলল।

উত্তেজিত হয়ে উঠল টিরা। 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই চাই। তোমার মত প্রকৃতির একজন সঙ্গী চাই আমি।'

'কিন্তু ওইসব অশরীরী বস্তুর মধ্যে বিশেষ প্রকৃতির সঙ্গী খোঁজার ব্যাপারটা কেমন হাস্যকর মনে হয় না তোমার?'

'না। সবাই আলাদা আলাদা প্রকৃতির। তুমি একরকম, রাজা আরেকরকম। ভেবে দেখো, সৌরভ! ব্যাপারটা কত মজার। তুমি ছোটবেলা থেকে যা-যা হওয়ার স্বপ্ন দেখে আসছ, ইচ্ছে করলে তার সবই হতে পারবে।'

'তারপরও আমি "আমিই" থাকব?'

'তুমি শুধু তুমিই থাকবে না। তারচেয়েও বেশি কিছু হয়ে যাবে। তোমার মধ্যে জ্ঞানের আলো থাকবে। অজ্ঞানতা চিরতরে দূর হয়ে যাবে। তারপর...'

বাকি কথা কানে গেল না সৌরভের। পুরোপুরি নিঃসন্দেহ হওয়ার জন্য আরও অনেক প্রশ্ন করার ছিল টিরাকে, কিন্তু ওর রহস্যময় চোখের দিকে তাকিয়ে ভাষা হারিয়ে ফেলল। সব বাষ্প হয়ে উবে গেল যেন।

ওর কাঁধে রাখা টিরার হাতের আঙুলগুলো থেকে দেহে এক ধরনের এনার্জি ঢুকতে শুরু করেছে, স্পষ্ট টের পাচ্ছে ও। অমর হলে জীবনের স্বাদ কেমন হবে, তার নমুনা। ব্যাপারটা মন্দ লাগল না ওর। বরং ভালই লাগল।

অমর হবে সৌরভ।

যা খুশি তাই করতে পারবে।

মৃত্যু স্পর্শ করতে পারবে না ওকে।

এতকিছুর বিনিময়ে ভিতরে সামান্য কী পরিরর্তন হলো না হলো, কিছু আসে-যায় তাতে?

টিরার দিকে ফিরে মৃদু হাসল সৌরভ। হাসল টিরাও।

বলার দরকার হলো না। সৌরভের জবাব পেয়ে গেছে ও।

'ঠিক আছে, টিরা। বলো, এবার কী করতে হবে আমাকে।'

বারো

জ্যোতির সামনের সোফায় বসে আছে সারা আন্টি। একভাবে কথা বলে চলেছে। কাত হয়ে সোফার হাতলে হেলান দিয়ে আছে সে। তার পায়ের কাছে বিশাল একজোড়া বিদেশী কুকুর বসা।

ভয়ঙ্কর চেহারা ওগুলোর। বাঘের মত কড়া দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। চাউনি দেখলেই বুকের রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে আসে। এতক্ষণ ছিল না কুকুর দুটো, এইমাত্র এসে বসেছে।

জিভ বের করে হাঁপাচ্ছে। জ্যোতির উপর কড়া নজর। তেড়িবেড়ি দেখলেই খবর করে দেবে। ওগুলোর তাকিয়ে থাকার ধরন দেখে জ্যোতির মনে হলো, ও বুঝি মাইক্রোস্কোপের নীচে আছে।

'ওগুলোর বয়স কিন্তু অনেক বেশি। তোমার কল্পনার চাইতেও অনেক প্রাচীন ওরা। সাগর-মহাসাগর যত পুরনো, পাহাড়-পর্বত যত পুরনো, ওরাও ততই পুরনো। শক্ত প্রতিপক্ষের তাড়া খেয়ে পৃথিবীতে এসে গা ঢাকা দিতে চেয়েছিল,' মাথা নাড়ল আন্টি। 'কিন্তু ফেঁসে গেছে। বুঝতে পেরেছ?'

'ওগুলো কোত্থেকে পৃথিবীতে এসেছে, নির্দিষ্টভাবে জানতে পেরেছেন?'

'না, নির্দিষ্টভাবে জানা যায়নি। তবে বহুদূরের কোন গ্রহ থেকেই হবে নিশ্চয়ই। কতদূরের, তা-ও বলতে পারব না। কারণ সময় আর দূরত্বের ব্যাপারটা আমার ক্রিস্ট্যাল বলের "ভিশন", অর্থাৎ দেখার ক্ষমতার বাইরে। তার মানে, আমার ধারণা নিশ্চয়ই হাজার হাজার শতাব্দী আলোক বর্ষ দূরের কোন সৌরজগৎ থেকে এসেছে।'

'এখানে এসে কীভাবে আটকা পড়ল ওগুলো?' জ্যোতি প্রশ্ন করল। 'কেন?'

'সে তো আগেই বলেছি। ওই বলগুলোর মধ্যে যাদের আত্মা আছে, তারা জানের ভয়ে আমাদের পৃথিবীতে এসে বাঁচতে চেয়েছিল। কিন্তু নিজেদের ভিতরকার কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করায় পুরোপুরি ফেঁসে গেছে। প্রতিপক্ষ এসে বলের মধ্যে আটকে রেখে গেছে ওগুলোকে।'

'ওদের ছেলেমেয়ে নেই?' জ্যোতি প্রশ্ন করল।

'আমার জানামতে নেই।'

'কিন্তু, আন্টি, আত্মা জিনিসটা আমি যতদূর জানি বায়বীয় হয়ে থাকে। সেই জিনিসকে একটা বলের মধ্যে কীভাবে বন্দি করে রাখা সম্ভব?'

'তোমার এ প্রশ্নের জবাব ঘটনার সময়কার বিজ্ঞানীরা দিতে পারত হয়তো,' হাসির ভঙ্গি করল আন্টি। 'অথবা জাদুকরেরা, যারা কাজটা করেছে। আমি পারব না।'

মাথা দোলাল জ্যোতি। 'টিরার মধ্যে ওদের একটা তো যেভাবে হোক, ঢুকেই গেছে দেড়শো বছর আগে। এত বছর ওটা

তা হলে বাকি আত্মাগুলোকে ছাড়াবার চেষ্টা করেনি কেন? পৃথিবীতে বসে না থেকে নিজেদের গ্রহে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করেনি কেন ওগুলো?'

'জানি না। হয়তো হাজার হাজার আলোকবর্ষ দূরের পথ পাড়ি দেওয়া সম্ভব না দেখে ভয়ে সে চেষ্টাই করেনি টিরা...বা, ওটা যেই হোক। সাহস হয়নি। অথবা হয়তো বিদ্রোহী পক্ষের ভয়ে যায়নি। তা ছাড়া আরেকটা জরুরি কথা ভুলে যাচ্ছ তুমি। টিরার ভিতরের জিনিসটা মানুষের রূপ ধারণ করার দেড়শো বছর পর গতকালই দ্বিতীয়টার রাজার ভিতরে ঢোকার সুযোগ হয়েছে। এখন হয়তো ওরা দু'জনে মিলে কিছু করতে পারবে। ভেবে দেখো, টিরার একার পক্ষে এরচেয়ে বেশি আর কিছু করা সম্ভব ছিল কি?'

কাছের কুকুরটার মাথায় আদর করে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল আন্টি। 'এক ধরনের অদ্ভুত সময়ের ফাঁদে আটকা পড়ে গেছে ওরা,' আবার বলল সে। 'বুঝলে? মনে হচ্ছে এ ফাঁদ থেকে কোনদিনও মুক্তি নেই ওদের। তাই আমার ধারণা এখন ওরা মানুষের রূপ ধরার জন্য মরিয়া হয়ে উঠবে। দু'জন থেকে তিনজন, তিনজন থেকে চারজন, এইভাবে নিজেদের সংখ্যাবৃদ্ধির কাজ চালিয়ে যাবে। এটা সবার জন্য অবশ্যই বিপদের কথা। কারণ সুযোগ পেলে তোমার-আমার, যে কারও মধ্যে যখন-তখন ঢুকে পড়বে ওরা।'

'কিন্তু এই না বললেন ওরা দূরত্বের ভয়ে নিজেদের গ্রহে ফিরে যেতে সাহস পায়নি?'

'সে জন্যই তো এখন ওদের আরও বেশি মরিয়া হয়ে ওঠার ভয় আছে। ওরা যদি ভাবে এত পথ পাড়ি দেওয়া যাবে না, বা দেয়া গেলেও তাদের পৃথিবী তাদের জন্য নিরাপদ নয়, তখন আর সে চেষ্টা না করে পৃথিবীতেই থেকে যেতে চাইতে পারে ওরা। তা করতে চাইলে মানুষের উপর ভর করতেই বেশি আগ্রহী হয়ে উঠতে পারে। বংশ বৃদ্ধি করতে হবে না?'

উঠে পড়ল সারা আন্টি। তার দেখাদেখি কুকুর দুটোও উঠতে যাচ্ছিল, কিন্তু একটা আঙুল তুলে নীরবে কিছু নির্দেশ দিল সে। 'কুঁই, কুঁই!' শব্দ করে বসে পড়ল ওগুলো।

দু'হাত পিছনে বেঁধে কিছুক্ষণ পায়চারী করল আন্টি। ডান হাতের তর্জনী নড়ছে সারাক্ষণ। যেন শূন্যে জটিল কোন হিসাব লিখছে। একটু পর রুমের আরেক মাথায় গিয়ে ঘুরল সে।

'হাজার হাজার বছর মহাকালের গর্ভে চলে গেছে। এত সুদীর্ঘ সময় বেঘর হয়ে থাকা, অজানা এক জগতে উড়ে উড়ে বেড়ানো যে কতবড় বেদনাদায়ক, সে কথা কেউ কল্পনা করতে পারে বলে আমার মনে হয় না। এ কী যা-তা কথা! এ জন্যই ওগুলো বিপজ্জনক।'

'বোধহয় ঠিকই বলেছেন আপনি,' কিছু সময় চিন্তা করে বলল জ্যোতি।

'কোনকালে আত্মাগুলোর মধ্যে সামান্য মানবতাবোধ হয়তো ছিল, কিন্তু এখন তা আছে বলে আমি মনে করি না। থাকতে পারে না। ওরা যদি নির্দয় হয়ে ওঠে, কিছু করার থাকবে না। ওগুলোকে এখন মানুষের দেহ ধারণ করে বেঁচে থাকার লোভে

পেয়ে বসলেও কারও কিছু করার নেই। যার প্রকৃতি যেমনই হোক না কেন, তার নিজের জীবন যাপন করার পূর্ণ অধিকার নিশ্চয়ই আছে। জীবনের লোভ কার নেই, বলো? তোমার নেই? আমার নেই?'

'টিরা...টিরা মেয়েটা কী...'

'ওর ব্যাপারটা একটু ব্যতিক্রম,' জ্যোতিকে থামিয়ে দিল সারা আন্টি। 'আমি জানতে পেরেছি, ও চট্টগ্রামের অনেক ধনী এক লোকের মেয়ে ছিল। বাবা সারাদিন তার ব্যবসা নিয়ে থাকত, মা থাকত তার সংসার আর সমাজসেবা নিয়ে। মেয়ের পিছনে একেবারেই সময় দিত না কেউ। খুব নিঃসঙ্গ বোধ করত মেয়েটা। ডাক্তারের পরামর্শে একবার বাপ-মা ওকে বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিল কক্সবাজারে। সেখানে এই দুর্ঘটনা ঘটে। তবে বর্তমান টিরাও খারাপ নয় কিন্তু। রাজাকে নিজের দলে টেনে নেওয়ার পরও ও দ্বিধাগ্রস্ত। এখন সৌরভকে দলে টানার চেষ্টা করছে ঠিকই, কিন্তু দুর্বলভাবে।'

কিছু সময় চুপ করে থাকল ও। 'রাজার কী অবস্থা?'

'ওর মধ্যে আশ্রয় নেয়া আত্মাটা বজ্জাত ধরনের। ভীষণ প্রতিশোধপরায়ণ।'

'ওদেরকে আত্মার আগ্রাসনের হাত থেকে বাঁচানোর কী উপায় আছে, আন্টি?'

থমকে দাঁড়াল সারা আন্টি। 'আছে কয়েকটা উপায়। কিন্তু তার আগে পেটে কিছু দিতে হবে। এসো, খেয়ে নিই। তারপর কথা বলা যাবে।'

'অসম্ভব, আন্টি!' লাফিয়ে ওঠার জোগাড় করল জ্যোতি। 'আমার বন্ধুরা চরম বিপদে আছে। এ সময়ে আমার গলা দিয়ে কিছুই নামবে না।'

মাথা ঝাঁকাল সারা আন্টি। 'পৃথিবীকে রক্ষা করার দায়িত্ব বুঝি কেবল তোমার একারই? আর কেউ কিছু করতে পারবে না? এই জন্যই দলের সবাই তোমাকে ভীষণ ভালবাসে।' আবার মাথা ঝাঁকাল। 'কিন্তু ভাল কাজ করার লোকের অভাব নেই দুনিয়াতে। আরও অনেক সাহসী, বুদ্ধিমান লোক আছে।'

'তা আছে,' আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে বলল ও। 'কিন্তু...'

'টিরা আর রাজার ভিতর থেকে আত্মাগুলোকে কীভাবে ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে হবে, তা ঠিক না করা পর্যন্ত তোমার কিছুই করার নেই, জ্যোতি। কাজেই মাথা ঠাণ্ডা রেখে খেয়ে নাও। বলো, কী খেতে চাও?'

'কী রান্না হয়েছে?'

'মুরগি ভুনা, চিতল মাছের কোপ্তা, মুড়ো ঘণ্ট...'

'নিয়ে আসুন, নিয়ে আসুন!' জিভে পানি এসে গেল ওর। 'সবগুলোই দেখছি আমার প্রিয় খাবার!'

'সেই জন্যই তো রান্না করা হলো! আরাম করে বোসো। আমি আসছি।'

'কী মুশকিল!' বিড়-বিড় করে বলল ও। 'ওদিকে সবাই কতবড় বিপদে আছে, আর এদিকে আমি প্রিয় ডিশ...'

দরজার কাছে গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল সারা আন্টি। মুচকি হেসে বলল, 'তোমার খাওয়ায় যাতে রুচি আসে, সে জন্য বলছি, ঊর্মি

আর তিয়ানার বিপদ কেটে গেছে।'

চোখ কুঁচকে উঠল ওর। 'সত্যি বলছেন?'

হাসি চওড়া হলো আন্টির, কিন্তু দৃষ্টি অদ্ভুতরকম শূন্য। মনে হলো–বহু দূরের কিছু দেখছে।

'আমার মিথ্যে বলার অভ্যাস নেই। আরও আছে, ওরা এখানেই আসছে।'

জ্যোতিকে বাকহারা করে রেখে বেরিয়ে গেল সে।

তেরো

পনেরো মিনিট পর। গৃহকর্ত্রী পথ দেখিয়ে ডাইনিং রুমে নিয়ে এল উর্মি আর তিয়ানাকে। জ্যোতি তখন মাছের কোপ্তা শেষ করে মুরগি ভুনা নিয়ে পড়েছে।

ঘরে পা রেখেই ওরকম একটা দৃশ্যে মেজাজ সপ্তমে চড়ে গেল তিয়ানার। 'কী! ওদিকে আমরা যুদ্ধ করে মরছি, আর তুই কিনা এদিকে গুদাম ভরছিস?'

'আহা, রাগ করছিস কেন? আন্টি খুব যত্ন করে রেঁধেছেন। খা না, তোরাও বসে যা! উর্মি আপু, এই চেয়ারে বোস। খেতে খেতে কথা বলি।'

আরও রেগে গেল তিয়ানা। 'নিজের মত পেটুক ভাবিস নাকি

সবাইকে? ওদিকে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে…'

'আহ, থাম!' ঊর্মি বলল। 'আন্টি, আমাদেরকে এই সময় কেন নিয়ে এলেন? জ্যোতিই বা কী করছে এখানে?'

'বোসো,' শান্ত গলায় বলল সারা আন্টি। 'খেয়ে নাও। কথা পরে হবে।'

দ্বিধায় পড়ে গেল ঊর্মি। 'আন্টি, রান্নার গন্ধ তো চমৎকার লাগছে। সকাল থেকে এত লাফ-ঝাঁপ করতে হয়েছে যে খিদেও লেগেছে খুব। পেট মোচড় দিচ্ছে। কিন্তু ওদিকের কী অবস্থা জানেন?'

মাথা দোলাল আন্টি। 'জানি। হাজার হাজার আলোর বল কক্সবাজার শহরের দিকে উড়ে আসছে। রাজা ওগুলোকে মানুষের মধ্যে ঢোকার পথ সহজ করে দেওয়ার জন্যে কাজ করে চলেছে। এই তো?'

'হ্যাঁ,' তিয়ানা বলল। 'ওগুলোকে ঠেকাতে হবে, আন্টি। যেভাবে হোক।'

'অবশ্যই ঠেকাতে হবে,' ধৈর্যের সঙ্গে বলল মহিলা। 'কিন্তু সে জন্য খাওয়া বন্ধ রাখতে হবে, তা কেন? বোসো। খেয়ে নাও আমাদের সঙ্গে। তারপর দেখি বলগুলোকে ঠেকানোর জন্যে কী কী পদক্ষেপ নেয়া যায়!'

'দিন তা হলে,' তিয়ানা বলল। 'ভয় পেলে আমার আবার বেশি বেশি খিদে লাগে!'

মিনিট দশেক নীরবে খেল ওরা, তারপর গৃহকর্ত্রী মুখ খুলল। 'রাজার ভিতর থেকে জিনিসটাকে কীভাবে বের করা যায়, তোমরা

কিছু ভেবেছ সে ব্যাপারে?'

তিয়ানা ভুরু কোঁচকাল। একটা কোপ্তা মুখের সামনে তুলে ধরে থেমে গেল। 'আমি ভাবিনি। আপনি ভেবেছেন?'

'ভেবেছি। কিন্তু তোমরা কী ভাবছ, আগে তাই শুনতে চাই। তুমি, ঊর্মি? জ্যোতি?'

'আমি লক্ষ করেছি...' ঊর্মি বলল চিন্তিত মনে, 'আত্মাগুলো যে বলের মধ্যে থাকে, সেগুলোর সঙ্গে বৈদ্যুতিক চার্জের একটা সম্পর্ক আছে। আমি ভাবছিলাম, সেটাকেই ওগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যায় কি না চেষ্টা করে দেখা দরকার।'

'ঠিক!' উত্তেজিত হয়ে উঠল জ্যোতি। 'একদম উপযুক্ত কাজ হবে সেটা।'

'তা হলে তো ভালই হলো,' তিয়ানা খুশি হয়ে উঠল। 'অনেক কম কষ্টে কাজ শেষ করতে পারব আমরা। গাড়ির ব্যাটারির সঙ্গে তার লাগিয়ে রাজাকে ধরে এনে শক দিতে হবে। তা হলে আত্মা-ফাত্মা সব বাপ-বাপ করে পালাবে।'

'কিন্তু ওকে ধরব কীভাবে?' ঊর্মি বলল। 'অসম্ভব শক্তি ওর গায়ে, মনে নেই?'

জ্যোতি বলল, 'তা হলে ওকে ধরার কষ্ট করবই না আমরা। কাছে এলেই শক দিয়ে দেব।'

'কিন্তু ওকে আমরা পাচ্ছি কোথায়?' তিয়ানা বলল।

হাসল সারা আন্টি। 'এ তো সহজ কাজ। মানুষজন যেখানে ভয়ে চেঁচাবে, সেখানে গেলেই ওকে পাবে।'

'আপনি ঠিকই বলেছেন!' মাথা ঝাঁকাল ঊর্মি। 'তা হলে আর

চিন্তা নেই। কিন্তু…বাকি হাজার হাজার বলের ব্যাপারে কী করব আমরা? সবগুলোকে তো আলাদা আলাদাভাবে শক দেয়া সম্ভব হবে না। তার আগেই তো আমাদের দফা-রফা হয়ে যাবে!'

'তা হলে সারা কক্সবাজার শহরকে শক দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে,' জ্যোতি বলল।

'কীভাবে?' তিয়ানা বলল।

আকাশ দেখাল ও। 'ওখানকার আকাশে মেঘ দেখে এসেছি আমি। শহর কেমন অন্ধকার! আমার ধারণা যে কোন সময় বৃষ্টি শুরু হয়ে যেতে পারে। তার সঙ্গে কায়দামত বজ্রপাতের ব্যবস্থা করা গেলেই মামলা খতম।'

'বৃষ্টি হবে কি না তারই ঠিক নেই,' ঊর্মি বলল। 'গত দু'দিন ধরে তো কেবল "হবে, হবে!" শুনেই আসছি। আজকের এই মেঘ থাকবে কি না, আমার তাতে সন্দেহ আছে।'

'ইস!' মাথা চুলকাল জ্যোতি। 'মেঘের মধ্যে যদি ফসলের বীজের মত ঝড়বৃষ্টির বীজ ফেলার কোন উপায় থাকত! যদি একইভাবে বজ্রপাতের আয়োজন করা যেত!'

'কী সব আবোল-তাবোল বকছিস?' ধমক লাগাল ঊর্মি। 'জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছিস নাকি? তুই…' সারা আন্টিকে হাসতে দেখে থেমে গেল ও।

জ্যোতির দিকে ফিরে প্রশংসার হাসি হাসছে সারা আন্টি। বলল, 'চমৎকার, জ্যোতি! তুমি নিজেদের সমস্যা সমাধানের পথ দেখাতে পেরেছ। আমি তোমার চাহিদামত কিছু ঝড়বৃষ্টির বীজের ব্যবস্থা করে দিতে পারি। তাতে মেঘ হবে, বজ্রপাত আর বৃষ্টিও

হবে। কিন্তু ওগুলো ছিটাবার জন্য মেঘের ওপরে উঠতে হবে তোমাদেরকে।'

'আপনার জাদু-ই-ঝাড়ুটা কিছুক্ষণের জন্য ধার দিলে...'

'আমার কোন জাদু-ই-ঝাড়ু নেই,' তিয়ানাকে মাঝপথে থামিয়ে দিল আন্টি। 'তুমি চাইলে তোমাকে ঝাড়ু বানিয়ে দিতে পারব। রাজি আছ? ওদিকের কাজ সেরে এসে আমার বাড়ি ঝাড়ু দেবে বাকি জীবন।'

ওরা সবাই হেসে উঠল একযোগে।

'এই!' উর্মি উল্লসিত হয়ে উঠল। 'সরোয়ার আঙ্কেলের হট এয়ার বেলুন নিয়ে আকাশে উঠব আমরা! উনি বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর রিটায়ার্ড অফিসার। যুদ্ধ করার সুযোগ পেলে নিশ্চয়ই ছাড়বেন না!'

তিয়ানা বলল, 'কিন্তু ওটায় না কী সমস্যা দেখা দিয়েছিল?'

'ঠিক হয়ে গেছে,' জ্যোতি আন্টির দিকে ফিরল। 'তা হলে তাই দিন, আন্টি।'

'চমৎকার!' বলল উর্মি। 'একবার বাজ পড়া শুরু হয়ে গেলে আর দেখতে হবে না। সবগুলো শয়তানের ওপর পড়বে, একসঙ্গে সব ঝামেলা শেষ হয়ে যাবে।'

'ওগুলো শয়তান নয়,' আন্টি বলল মৃদু কণ্ঠে। 'অন্য কোন গ্রহ থেকে পৃথিবীতে এসে আটকে যাওয়া কিছু আত্মা।'

'এতে কাজ হবে তো?' জ্যোতির গলায় সন্দেহ ফুটল।

মাথা নাড়ল গৃহকর্ত্রী। 'তা এখনই নিশ্চিত করে বলা যাবে না। তবে হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।'

দুই হাত ডলল ঊর্মি। 'তা হলে আত্মাগুলো সরাসরি ফাঁদের দিকে আসছে। আসতে থাকুক।'

জ্যোতি মাথা নাড়ল। 'তোরা সবটা জানিস না। জানলে ওগুলোর জন্যে কষ্ট লাগত।'

'আমাদের রাজার দেহে বাসা বেঁধেছে, এমন কিছুর জন্যে কষ্ট? কী বলছিস তুই?'

'তোমরা সবাই শুধু রাজাকে নিয়েই মাথা ঘামাচ্ছ! সৌরভের কথা ভাবছ না কেউ।'

চমকে উঠল ওরা।

'সৌরভ!' জ্যোতি বলল। 'সৌরভের আবার কী হলো?'

'ও টিরার ফাঁদে পড়েছে,' সহজভাবে বলল সারা আন্টি। 'টিরা ওকেও দলে ঢুকিয়ে নিতে যাচ্ছে।'

তিয়ানা বসা থেকে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। উত্তেজিত। 'কী বললেন, এতবড় সাহস টিরার? সৌরভের কিছু হলে ওকে আমি জানে মেরে ফেলে দেব না!'

'ওই কাজটা সহজ হবে না,' গম্ভীর মুখে মাথা নাড়ল মহিলা। 'কারণ তোমরা কিছু করতে পারার আগেই টিরা যদি সৌরভকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নিজের মত করে নিতে পারে, তা হলে সে-ও তোমাদের বড় শত্রুতে পরিণত হবে।'

চোদ্দো

জ্যোতির হাতে ছোট একটা প্লাস্টিক ব্যাগ তুলে দিল সারা আন্টি। 'এই নাও তোমাদের "বীজ"। মেঘের ওপরে উঠে মুঠো মুঠো করে মেঘের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারলেই তোমাদের কাজ হয়ে যাবে আশা করি।'

ব্যাগের মুখ সামান্য ফাঁক করে ভিতরে উঁকি দিল জ্যোতি। ভিতরে মনে হলো কয়েক মুঠো পরিমাণ ধুলো আছে। ওর চেহারায় কিছুটা হতাশা দেখে হাসল সারা আন্টি। 'নিশ্চিন্ত মনে চলে যাও।'

শক দেওয়ার জন্য কিছু তারও নিল ওরা। একটা কার ব্যাটারি জোগাড় করে ওটার সঙ্গে জুড়ে নিয়ে কাজ সারবে। তারপর কবরস্থানে চলে এল জ্যোতিরা। ভর দুপুর এখন। গরমও পড়েছে বেশ। রাস্তাঘাট প্রায় ফাঁকাই বলা চলে। কেউ লক্ষ করছে না।

গর্তটার কাছে গিয়ে চোখ বুজল ওরা, মনে মনে তিন পর্যন্ত গুণল। পরমুহূর্তে জোরাল একটা টান অনুভব করল। মনে হলো দ্রুত সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ওরা–নিকষ কালো একটা ভেলভেট টানেলের মধ্য দিয়ে।

নাকেমুখে ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটা লাগতে চোখ মেলল ওরা। পরক্ষণে থতমত খেয়ে গেল ব্যাপার দেখে। মাথার উপরে কয়েক হাজার আলোর বল ভাসছে। শহরের দিকে আসছে ওগুলো। আগের চেয়ে গতি একটু বেড়েছে। শহরের মানুষ অদ্ভুত জিনিসগুলো দেখে আতঙ্কিত। প্রাণভয়ে পাগলের মত ছোটাছুটি করছে আর চিৎকার করছে।

কক্সবাজারে আকাশ অন্ধকার। বেশ মেঘ করেছে।

কাছেই কেউ চিৎকার করছে শুনে তাকে খুঁজল ওরা। কবরস্থানের গেটের দিক থেকে আসছে চিৎকারটা। রাজাকে দেখা গেল সেখানে। এক বুড়ো, হাড্ডিসার ভিখারিকে ধরে কবরস্থানের গেটের সঙ্গে বাঁধছে, লোকটা ছাড়া পাওয়ার জন্য প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে।

রাজা তা হলে যতজনকে সম্ভব অচল করে দেওয়ার কাজে ব্যস্ত আছে এখন, ভাবল জ্যোতি। যাতে বলগুলো এসে তাদের মধ্যে অনায়াসে ঢুকে পড়তে পারে।

'আগে তো অনেক ধীর ছিল ওগুলোর গতি!' তিয়ানা বলল চিন্তিতমনে। 'এখন একটু জোরে চলছে মনে হচ্ছে না?'

'মনে হয় বাতাস অনুকূলে আছে বলে জোরে চলছে,' ঊর্মি বলল।

'অথবা মিলিয়ন মিলিয়ন বছর বলের মধ্যে আটক থেকে হাঁপিয়ে উঠেছে আত্মাগুলো,' জ্যোতি বলল। 'তাই মানুষ হতে পারার নিশ্চয়তা পেয়ে আর দেরি সহ্য হচ্ছে না। তাড়াহুড়ো করে ছুটছে।'

দূরে দাঁড়িয়ে থাকা একটা কার দেখাল জ্যোতি.। 'ওসব নিয়ে পরে মাথা ঘামাব। আগে ওই কারটার ব্যাটারি দিয়ে রাজাকে শক দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। কাজ হয় কি না দেখতে হবে। হলে আর চিন্তা নেই।'

'কিন্তু কারের ড্রাইভারকে তো দেখছি না,' তিয়ানা বলল। 'ব্যাটারি নিবি কীভাবে?'

'খুলে নেব!'

'চুরি করবি? কিন্তু চুরি তো...'

হাত নেড়ে মাছি তাড়াবার ভঙ্গি করল জ্যোতি। 'আরে, থাম! নীতিবাগিশ কোথাকার! জান বাঁচানো ফরজ, জানিস না? তা ছাড়া আমরা কি সত্যি সত্যি চুরি করছি নাকি? কাজ হলেই তো ফিরিয়ে দেব। তা ছাড়া রাজাকে যখন হাতের কাছে পেয়েই গেলাম, সবার আগে ওর ব্যবস্থা না করে ছাড়ছি না আমি।'

কারের চালককে আশপাশে পাওয়া গেল না। খুব তাড়াহুড়ো করে পালিয়েছে বোধহয় লোকটা, ভাবল জ্যোতি। কারণ ইগনিশনে চাবির গোছা ঝুলছে। শুধু ঝুলছেই না, একটু একটু দুলছেও।

বনেট তুলে ব্যাটারিটা বিচ্ছিন্ন করল ও, বের করে নিয়ে এল। তারপর সঙ্গে নিয়ে আসা লম্বা লম্বা তারগুলো জুড়ে নিল ওটার সঙ্গে। ব্যাটারি কাঁধে তুলে নিল জ্যোতি, ওদিকে তারের প্রান্তগুলো হাতে নিয়ে ওর পাশাপাশি এগোল ঊর্মি।

ততক্ষণে কবরস্থানের গেটের সঙ্গে বুড়ো লোকটাকে প্রায় বেঁধে ফেলেছে রাজা।

'রাজা আমাদেরকে দেখে ফেলার আগেই ওকে কাবু করতে হবে,' বলল জ্যোতি। 'নইলে এরপর ও আমাদেরকে ধরবে।'

'তার দিয়ে আমাকে কী করতে হবে?' উর্মি জানতে চাইল নার্ভাস গলায়।

'ওর গায়ের সঙ্গে লাগিয়ে ধরে থাকবি। নেগেটিভ আর পজিটিভ তার একসঙ্গে করে।'

'তাতে কী হবে?'

'স্পার্ক হবে,' বলল জ্যোতি। 'শক...'

'রাজা মরে যাব না তো!'

মাথা নাড়ল ও। 'হয়তো ওর হার্ট থেমে যাবে। কিন্তু ঝুঁকিটা না নিয়েও আমাদের উপায় নেই। রেডি! এই রে! ও দেখে ফেলেছে আমাদেরকে।'

সত্যি দেখে ফেলেছে রাজা। বিদ্যুতের ঝলকের মত বৃদ্ধকে ছেড়ে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল ও। মাঝের ত্রিশ-চল্লিশ গজের মত ব্যবধান খুব দ্রুত পেরিয়ে এল। এতই দ্রুত যে উর্মি থতমত খেয়ে গেল। ভয়ে কাঁপুনি উঠে গেল ওর। কিন্তু তার মধ্যেও জ্যোতির নির্দেশ পালন করতে ভুল হলো না।

ঠিক সময়মত দুটো তার এক করে ধরতে রাজা নিজেই সেটার উপরে এসে পড়ল। পরক্ষণে তীব্র লালচে আগুনের ঝলকের সঙ্গে ছিটকে কয়েক হাত দূরে গিয়ে আছড়ে পড়ল রাজা।

উর্মিও ছিটকে পড়ল। কিছুক্ষণ চোখের সামনে হাজার হাজার তারা দেখল ও, মাথার মধ্যে পুরোপুরি তালগোল পাকিয়ে গেছে।

কারা যেন ঢাক-ঢোল বাজাচ্ছে ওখানে। একতারা আর খঞ্জনীও আছে তার সঙ্গে।

গত কয়েক সেকেন্ডের কথা ভুলে থাকল কিছু সময়ের জন্য। স্মৃতিশক্তি ফিরতে প্রথমে বুঝে উঠতে পারল না ও কোথায় আছে। ওই অবস্থায় প্রথম যে ভাবনা মাথায় এল, তা হলো ও ব্যর্থ হয়েছে। সর্বনাশ ঠেকানোর আর কোন উপায় থাকল না।

কিন্তু না। হাঁচড়েপাঁচড়ে উঠে বসে রাজাকে পাশেই দেখতে পেল ও। হতভম্বের মত বসে আছে। পেটের কাছের পোড়া একটা দাগের উপর হাত বোলাচ্ছে আর এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। উর্মির দিকে চোখ যেতে পিট-পিট করে তাকাল।

'কেন করলি কাজটা?' অভিযোগের সুরে বলল রাজা। 'আমার ব্যথা লাগে না?'

'রাজা!' আনন্দে চিৎকার করে উঠল উর্মি। 'রাজা! তুই তা হলে স্বাভাবিক হয়ে গেছিস?'

আরও হতভম্ব হয়ে গেল রাজা। 'স্বাভাবিক হয়ে গেছি মানে? অস্বাভাবিক ছিলাম কখন?' চোখ বড় বড় করে এদিক-ওদিক তাকাল। 'এখানে এলাম কীভাবে? এটা কোন জায়গা?'

তিয়ানা ওর পাশে হাঁটু গেড়ে বসল। 'তোর কিছু মনে নেই? কিছু বুঝতে পারছিস না?'

চোখ কুঁচকে মাথা নাড়ল রাজা। 'না তো! বুড়ো মানুষটাকে কে বাঁধল ওইভাবে?'

'তুই বেঁধেছিস!' চেঁচিয়ে উঠল জ্যোতি। উঠে গিয়ে তাকে ছেড়ে দিল।

''আমি? দূর!' বলল রাজা। 'আমি তো তোদের সঙ্গে লেকের পারে ছিলাম! টিরা নামের সেই নতুন মেয়েটা আলোর বলগুলোর নীচে গিয়ে দাঁড়াল। ওর ক্ষতি হতে পারে ভেবে আমি কাছে গিয়ে...' থেমে মাথা চুলকাল। 'তারপর কী হয়েছিল?'

'অনেক কিছুই হয়েছে,' ওর মাথায় মৃদু চাপড় লাগাল উর্মি। 'নে ওঠ। এখন সে সব ব্যাখ্যা করার সময় নেই। জ্যোতি আর তিয়ানা সৌরভকে খুঁজে বের কর গিয়ে। আমি রাজাকে নিয়ে বেলুনে করে "বীজ" ছড়াতে মেঘের ওপরে যাব। মনে হচ্ছে আজ বৃষ্টি হবেই।'

'"বীজ" কী?' রাজা জানতে চাইল।

'বললাম না এখন কথা বলার সময় নেই?' উর্মি উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল ওকে। বলল। 'চল। সরোয়ার আঙ্কেলের বেলুন এখন ঠিক থাকলে হয়।'

রাজার মাথা তখনও পরিষ্কার হয়নি। বলল, 'কেন আকাশে উঠতে হবে আমাদেরকে?'

'কারণ মেঘের মধ্যে এই বীজ ছড়িয়ে দিলে বৃষ্টি হবে,' হাতের ব্যাগটা দেখাল ও। 'তখন যাতে বিদ্যুৎ চমকায়, বাজ পড়ে, তাই। তা হলে ওই যে বলগুলো দেখছিস, সবগুলোর ভেতরের আত্মা পুড়ে খতম হয়ে যাবে।' খিল-খিল করে হাসল উর্মি। 'তোর পেটের মত।'

'সৌরভের কথা কী বলছিলি? ও কোনও বিপদে আছে?'

গম্ভীর হয়ে উঠল উর্মি। 'হ্যাঁ। ওর আত্মা এখন খুব বিপদে আছে। টিরা ওকে পুরোপুরি কবজা করে ফেলার আগেই যদি

ওকে আমরা ছাড়িয়ে আনতে না পারি, তা হলে চিরতরে হারাতে হতে পারে ওকে।'

পনেরো

পনেরো মিনিট পর ঊর্মি ও রাজাকে নিয়ে মাটি ছাড়ল সরোয়ার সাহেবের বেলুন।

দুপুরে খাওয়ার পর সরোয়ার সাহেব ভাবছিলেন একটু গড়িয়ে নেবেন, কিন্তু জানালা দিয়ে বাইরে চোখ পড়তেই সে ইচ্ছা মাথায় উঠেছে তাঁর।

আকাশ ভর্তি হাজার হাজার সাদা বল ভাসছে!

জ্বল-জ্বল করছে। মনে হয় বালব জ্বলছে প্রতিটার পেটের মধ্যে। কালো মেঘে ছাওয়া আকাশের পটভূমিকায় হাজার হাজার আলোকিত বলের উড়ে আসার এমন অভাবনীয় দৃশ্যে গা ছম-ছম করে উঠল তাঁর।

সর্বনাশ! কী ওগুলো?

ধীরগতিতে ভাসতে ভাসতে এগিয়ে আসছে।

রীতিমত ভয় পেয়ে গেলেন তিনি।

এমন সময় কোত্থেকে ছুটতে ছুটতে এসে হাজির ঊর্মি আর রাজা। ওদের মুখে বলগুলোর বৃত্তান্ত শুনে মাত্র পাঁচ মিনিটের

মধ্যে আকাশে ওড়ার প্রস্তুতি সেরে ফেলেছেন তিনি।

এই মুহূর্তে বেলুন গনডোলার কিনারা আঁকড়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছে ওটার তিন যাত্রী। মন্ত্রমুগ্ধের মত একভাবে বলগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে। মাটি থেকে কম করেও দু'শো ফুট উপরে আছে সেগুলো—বেলুন থেকে তিন-চরশো গজ পুবে।

'তোমাদের এইসব ধুলোপড়া ওষুধে রোগ সারবে বলে আমার মনে হয় না,' এক সময় বললেন সরোয়ার সাহেব। তাঁর পায়ের কাছে দু'টো বন্দুক শুয়ে আছে। পাশে দুই বাক্স গুলি। 'পরিস্থিতি সুবিধার মনে হচ্ছে না। তবু, তোমরা তোমাদের প্ল্যানমত কাজ করে যাও। আমি বিমান বাহিনীর মানুষ ছিলাম। ওখানে আমাদের সব কাজে "ব্যাক-আপ" প্ল্যান থাকত। এখানেও সেই নিয়মে চলতে চাই আমি।'

'সেটা কী, আঙ্কেল?' ঊর্মি প্রশ্ন করল।

'গুলি করে কোন ফল হয় কি না দেখতে চাই আমি।'

'তা করা যেতে পারে।'

প্রায় ডজনখানেক বুলেট খরচ করার পর হাল ছেড়ে দিলেন তিনি। কাঁধ ঝাঁকিয়ে অসহায় ভঙ্গি করে বললেন, 'উচ্চতা আরও না বাড়া পর্যন্ত কাজ হবে না।'

'কিন্তু বেলুন তাড়াতাড়ি উঠছে না কেন?' ব্যস্ত কণ্ঠে বলল ঊর্মি।

রাজা বলল, 'আমাদের মধ্যে থেকে একজন লাফিয়ে পড়লে নিশ্চয়ই বেলুন তাড়াতাড়ি উঠবে!'

সরোয়ার সাহেব হাসলেন। বেলুনের খোলা মুখের কাছে ফিট

করা গ্যাস নজলের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'তার দরকার হবে না। কিছুটা হিট বাড়িয়ে দিলেই উঠতে শুরু করবে এটা।'

নজল খানিকটা ঘুরিয়ে দিলেন তিনি। আগুনের চওড়া শিখা হুপ্ করে লাফ দিল, সঙ্গে সঙ্গে বেলুনও লাফ দিল। উচ্চতা বাড়তে বাড়তে বলগুলোকে ছাড়িয়ে উঠে এল বেলুন। তারপর আরও খানিকটা উঠতে মেঘের উপরে চলে এল।

'আমি ওগুলোকে সাহায্য করতে যাচ্ছিলাম!' বিড়-বিড় করে বলল রাজা, 'বিশ্বাসই হতে চায় না।'

'তাতে কোন অন্যায় হয়নি,' ঊর্মি সান্ত্বনা দিল রাজাকে। 'তোর তখন নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ ছিল না। এরকম আমাদের সবারই হয়, বা হতে পারে।'

ঘুরে ঘুরে মেঘের উপর ধুলো ছড়ানোর কাজ শেষ করল ওরা। সারা আন্টির ধুলোপড়ায় যে কাজ হবে, তাতে কোন সন্দেহ ছিল না। তারপরেও ওরা অবাক না হয়ে পারল না খুব দ্রুত প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে যেতে দেখে।

ছড়ানোর কাজ শেষ হতে না হতেই আকাশে বিদ্যুতের খেলা শুরু হয়ে গেল। অনবরত চমকাতে থাকল আকাশ, তার সঙ্গে বিরতিহীন বজ্রপাত।

প্রতিটা বজ্রপাতের সঙ্গে তাল রেখে একের পর এক হাতুড়ির ঘায়ের মত আছড়ে পড়তে লাগল গনডোলার উপর। ভীষণভাবে দুলতে লাগল ওরা, পড়ে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচতে গনডোলার কিনারা আঁকড়ে ধরে বসে থাকল চোখ বুজে।

একটাই চিন্তা ঘুরছে সবার মাথায়—কাজ হচ্ছে তো?
মেঘের উপর থেকে তা বোঝার উপায় নেই।
ওরা শুধু আশা করতে পারে বিপদ কেটে যাবে।
সৌরভ নিরাপদ থাকবে।
শহরের মানুষও নিরাপদ থাকবে।

ষোলো

কিন্তু সৌরভের তখন খুব বাজে অবস্থা। পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে আছে ও, যেটায় এক শতাব্দীরও বেশি আগে টিরা বর্তমান ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিল।

ওর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে টিরা। বিড়-বিড় করে নানান কথা বলে সৌরভকে উৎসাহ দিয়ে চলেছে। দলে টানার চেষ্টা করছে।

আকাশজুড়ে ঘন, কালো মেঘের ব্যস্ত আনাগোনা চলছে। সূর্য ততক্ষণে ডুবে গেছে, কোন সন্দেহ নেই। গাঢ় অন্ধকারে ছেয়ে গেছে চরাচর। কিন্তু সৌরভের ডানদিকে একটা আলো জ্বলছে।

আলোর বল!

ধীরগতিতে ওদের দু'জনের দিকে এগিয়ে আসছে সেটা।

টিরা নিচু গলায় সৌরভকে অনুরোধ করছে বলটাকে স্বাগত জানাতে। নিশ্চয়তা দিয়ে বলছে, পৃথিবী নামের গ্রহে ওই ধরনের যত বল আছে, ওটাই তার মধ্যে সেরা বল।

'ওটাকে তোমার জন্য বিশেষভাবে আলাদা করে রেখেছি আমি,' টিরা বলল বিড়-বিড় করে। 'ওটা ভেতরে ঢোকার সময় কোন কষ্ট হবে না তোমার। রাজার মত জ্ঞানও হারাতে হবে না, ভয় নেই। সম্পূর্ণ সজ্ঞানে থাকবে তুমি। কিছু টেরই পাবে না।'

'ওটাকে আত্মা কেন বলছ তুমি?' সৌরভ জিজ্ঞেস করল।

'ওহ্, এই কথা!' মৃদু হাসল মেয়েটা। 'ওটা আসলে একটা কথার কথা। কিছু একটা বলতে হয়, তাই বলি। আমি জানি তোমার নিজেরই সুন্দর একটা আত্মা আছে। বিশ্বাস করো, ওই বলের আলো আসলে সেটাকেই আরও সমৃদ্ধ করবে। তোমার কোন ক্ষতি করবে না।'

নরম হাত ওর গালে বুলিয়ে নিল টিরা। ওর দৃষ্টি আঠার মত লেগে থাকল মেয়েটার ওপর। 'তুমি আমাকে বিশ্বাস করো। তাই না, সৌরভ? তুমি জানো তোমার ক্ষতি হয়, এমন কিছু আমি কখনও করব না। তাই না? করো না বিশ্বাস?'

মেয়েটার সাগরের মত নীল চোখের দিকে তাকিয়ে অজান্তেই হাসল সৌরভ। ওর চোখের সম্মোহনী শক্তি এত বেশি যে চোখ ফেরানো যায় না। সৌরভের মনে হলো, ও বুঝি তলিয়ে যাচ্ছে গভীর সাগরে।

গেলই বা, মনে মনে নিজেকে বলল ও। মন্দ কী?

‘কী? বিশ্বাস করো না?’ আবার প্রশ্ন করল টিরা।

মাথা ঝাঁকাল সৌরভ। ‘নিশ্চয়ই করি। করব না কেন? ওটা আমার ভিতরে ঢুকলে আমরা উড়তে পারব তো? ইচ্ছামত নক্ষত্র মণ্ডলীতে ঘুরে বেড়াতে পারব?’

টিরার মধ্যে কিছুটা ইতস্তত ভাব দেখা গেল। ‘ঠিক এখনই পারব না। তবে খুব শীঘ্রি পারব। যেখানে খুশি সেখানেই যেতে পারব আমরা।’

মাথার উপরে তীব্র নীলচে বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল। কয়েক মুহূর্তের জন্য দিনের মত আলো হয়ে গেল চারদিক। ভয় পেয়ে লাফিয়ে উঠল টিরা। পিছন থেকে সৌরভকে জাপটে ধরল।

মেয়েটা কাঁপছে বুঝতে পেরে ভারি অবাক হলো ও। কিন্তু তার কোন কারণ খুঁজে পেল না।

‘ভয় পেয়ো না,’ সৌরভ সাহস জোগাতে চাইল। ‘বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে।’

তবু কাঁপুনি থামছে না টিরার। ‘ব্যাপারটা পছন্দ হচ্ছে না আমার। এখনই কেন মেঘ করল?’

‘করুক না, তাতে আমাদের কী?’ অবাক হলো সৌরভ। ‘তুমি না বললে, কোনকিছুই আর আমাদের ক্ষতি করতে পারবে না!’

সৌরভকে ছেড়ে পিছিয়ে গেল টিরা। অগ্রসরমান আলোর বলটার দিকে তাকিয়ে থাকল। আর মাত্র পঞ্চাশ-ষাট গজ দূরে আছে ওটা। বাতাস বিপরীত দিক থেকে ওদের দিকেই বইছে। তার মানে, দুই-এক মিনিটের মধ্যে আলোটা পৌঁছে যাবে ওদের

আছে।

সৌরভের কথা শুনে টিরা মনে হলো মুহূর্তের জন্য সন্দেহে ভুগল। তারপরই জোর করে হাসল।

'ঠিক বলেছ! কোনকিছুই আর আমাদের ক্ষতি করতে পারবে না! খুব শীঘ্রি তুমি আমার মত হয়ে যাবে। অমর, অপ্রতিরোধ্য, অজেয় আর অবিনশ্বর।'

ওর দিকে এগিয়ে এল মেয়েটা। বাঁ হাতের তালু ওর বুকের উপর রাখল। 'দেখো, ব্যাপারটা তোমার পছন্দ হবে। আমি জানি, পছন্দ হতেই হবে।'

'ওহ, আমার দেরি আর সহ্য হচ্ছে না!' ভিতরে ভিতরে চাপা উচ্ছ্বাস বোধ করল সৌরভ। বলল, 'দাঁড়াও, তোমার মত হয়ে সবার আগে বন্ধুদেরকে আমার ক্ষমতা দেখাব। তখন দেখো, ওদের চেহারা যা হবে না!'

টিরার হাসি একটু একটু করে মিলিয়ে গেল। নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে কিছু ভাবল ও।

'না, সৌরভ। তুমি মনে হচ্ছে পুরো ব্যাপারটা এখনও বুঝতে পারোনি। সেটা হচ্ছে, আমার মত হয়ে যাওয়ার পর তুমি আর তোমার বন্ধুদের কাছে ফিরে যেতে পারবে না। আর কখনও তা সম্ভব হবে না। আমি ভেবেছিলাম তুমি বুঝতে পেরেছ কথাটা। তখন তুমি শুধু আমার সঙ্গে থাকবে। শুধু আমার সঙ্গে।'

চোখ কুঁচকে উঠল ওর। 'পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারব না মানে? এ কেমন কথা? আমি যা চাই তা করতে পারব না?'

নজর নামিয়ে নিল টিরা। মৃদু গলায় বলল, 'তুমি যা চাও, তা অবশ্যই করতে পারবে। আসলে আমি বলতে চাইছি, এখন তোমার যা যা করতে ইচ্ছা করছে, পরে আর সেসব ইচ্ছা থাকবে না তোমার মধ্যে। তোমার চাহিদা তখন আরও বেড়ে যাবে। তুমি তখন আমার মত আলোর বলের সঙ্গে খেলা করবে। পুরনো বন্ধুদের কথা আর মনেই পড়বে না।'

কয়েক মুহূর্তের জন্য দ্বিধায় ভুগল সৌরভ। তারপর একটা অনুসন্ধানী প্রশ্ন জাগল মনে। 'ওগুলোর সঙ্গে খেলতে যদি এতই ভাল লাগে, তাহলে আমাকে তোমার কী দরকার?'

মুখ তুলল মেয়েটা। মনে হলো, আচমকা এমন এক প্রশ্নে থতমত খেয়ে গেছে। ভাষা ফিরে পেতে বেশ কিছুটা সময় লাগল ওর। 'তোমাকে আমার প্রয়োজন, ব্যাপারটা সেরকম নয়, সৌরভ। আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাইছি কেবল। তোমাদের জীবন থেকে মুক্তি দিয়ে আমাদের সুন্দর জীবনে নিয়ে আসতে চাইছি।'

বলতে বলতে ওর দু'হাতের মধ্যে এসে দাঁড়াল মেয়েটা। ওর চোখে চোখ রেখে একভাবে তাকিয়ে থাকল। মনে হলো, ওর চোখ ধাঁধিয়ে দিতে চাইছে মেয়েটা। ওকে কষ্ট দিতে নয়। ও যাতে সবকিছু ভুলে যায়, সেই জন্য।

ঘটলও তাই। মনের মধ্যে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জমে ছিল, সেগুলো মনে রাখতে সমস্যায় পড়ল সৌরভ। বলটা আরও কাছে এসে পড়েছে। ওটাকে কেবল দেখতেই পাচ্ছে না, ওটার শক্তিও অনুভব করতে পারছে।

মিনি পূর্ণিমার চাঁদের মত লাগছে ওটাকে, টিরার মাথার পিছনে জ্বল-জ্বল করছে। এগিয়ে আসছে ওর দিকে। অথবা ওকে ঘিরে থাকা স্বর্গীয় আলোর বলয়টার দিকে।

ঠিক, নিজেকে বোঝাল সৌরভ। টিরাকে সন্দেহ করার কোন কারণ নেই। ওর একটা ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি আছে। তার ভিত্তিতেই ওকে সাহায্য করতে চাইছে মেয়েটা। কাজেই পুরনো বন্ধুদের নিয়ে এ মুহূর্তে মাথা না ঘামালেও চলবে। ওসব নিয়ে পরে ভাবলেও চলবে।

সৌরভ জানে বন্ধুরা ভাল আছে। ও যদি তাদের সঙ্গে না-ও থাকে, তবু ভালই থাকবে।

এমন সময় নীচে থেকে তিয়ানার আতঙ্কিত চিৎকার শোনা গেল। 'সৌরভ, ওখান থেকে নেমে আয়! সাবধান, বলটা তোকে ছুঁয়ে ফেলতে পারে না যেন!'

টিরার প্রচণ্ড সম্মোহনী চাউনির কবল থেকে নিজেকে জোর মুক্ত করল সৌরভ। ঘুরে দেখল জ্যোতি আর তিয়ানা পড়িমরি করে উঠে আসছে। জ্যোতি একটু পিছিয়ে পড়েছে। ওর ঘাড়ে কী যেন একটা রয়েছে।

বড় একটা ব্যাটারি!

তিয়ানার হাতে লম্বা দুটো তার দেখতে পেল সৌরভ। কার ব্যাটারি! অবাক হয়ে ভাবল কিশোর। ওই ভারী জিনিসটা ঘাড়ে করে নিয়ে আসছে কেন জ্যোতি?

আবার বিদ্যুৎ চমকের আলোয় ধরণী ঝলসে উঠল। কানে তালা লাগানো বিকট শব্দে কাছেই কোথাও বাজ পড়ল। কী ঘটছে

না ঘটছে বুঝতে না পেরে কয়েক মুহূর্ত অনিশ্চয়তায় ভুগল সৌরভ।

তবে বজ্রপাতের শব্দে টিরা যে আবার ওকে জড়িয়ে ধরেছে, তা ঠিকই টের পেল। ওদিকে আলোর বলটাও একেবারে কাছে এসে পড়েছে।

'তোরা এখানে কেন?' বিস্ময় সামলে নিয়ে বলল ও।

'সরে আয়, সৌরভ! পাহাড় থেকে নেমে আয়!' আতঙ্কিত গলায় চেঁচিয়ে উঠল তিয়ানা। 'ওই মেয়ের কাছ থেকে সরে আয়! ও তোর আত্মা চুরি করতে চাইছে!'

সৌরভ কিছু বলতে পারার আগেই এক হাতে ওর কাঁধ আঁকড়ে ধরল টিরা। এক ঝটকায় নিজের দিকে ফিরিয়ে আবার ওর চোখে চোখ রাখল। কিন্তু এখন আর আগের মত স্থির নয় চাউনিটা, গভীরের কোথায় যেন কাঁপন ধরেছে।

'ওদের কথায় কান দিয়ো না, সৌরভ!' অনুনয় করল টিরা। 'আমি তোমার জন্য কী করতে চাই ওরা তা বুঝতে পারছে না! ওরা বুঝতে চায় না আমি তোমার বন্ধু। তোমার ভাল ছাড়া খারাপ চাইতে পারি না আমি।'

ওদিকে বলটা তখন একদম কাছে পৌঁছে গেছে।

'ও মিথ্যে কথা বলছে!' জ্যোতি বলল হাঁপাতে হাঁপাতে। 'সরে যা ওর কাছ থেকে। বলটার নাগাল থেকে দূরে থাক!'

আবার ওদের দিকে ফিরল সৌরভ। মনে হলো দু' ভাগ হয়ে গেছে ও। বুঝতে পারছে না টিরা কেন এক কথা বলছে, তিয়ানা-জ্যোতি কেন তার বিপরীতটা বলছে।

'মাথার উপরে এসে পড়া বলটার দিকে তাকাল ও। ওটার শক্তি আর ক্ষমতা একদম পরিষ্কার অনুভব করতে পারছে এখন। সেটা যে অপরিসীম, তা বুঝতেও কোন অসুবিধা হচ্ছে না।

তারপরও ওটা শুভ শক্তি কি না, তা নিয়ে কয়েক মুহূর্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগল। হঠাৎ কে যেন ভিতর থেকে খোঁচা মেরে সচকিত করল সৌরভকে।

'ওই...ওটা আসলে কী?' বলটা দেখিয়ে বলল সৌরভ। 'কী কাজ ওটার?'

'ওটা?' টিরা বলল। 'ওটা অপরিসীম ক্ষমতা আর সুখের পথ-প্রদর্শক। ওটা তোমাকে নিয়ে যাবে...'

'না, সৌরভ!' চেঁচিয়ে উঠল তিয়ানা। 'ওটা একটা প্রাচীন আত্মা, তোর আত্মা চুরি করতে এসেছে। একবার ভিতরে ঢুকে যেতে পারলে তোকে ধ্বংস করে ফেলবে!'

দ্রুত ঘুরে দাঁড়াল টিরা। গলার রগ ফুলিয়ে চিৎকার করে উঠল, 'বাজে কথা! ওর একটা আমার মধ্যেও তো ঢুকেছে। ওটার জন্যই তো আজ আমি এত ক্ষমতার অধিকারী। আমি আজ অমর। যা খুশি তাই করতে পারি। তা হলে তোমরা কেন সুযোগটা নিতে দিচ্ছ না ওকে? কেন বাধা দিচ্ছ?'

অবশেষে পাহাড়ের মাথায় পৌঁছল ওরা দু'জন। হাঁপাচ্ছে ভীষণভাবে। কথা বলার ক্ষমতা নেই কারও।

ভাসমান বলটার উপর থেকে নজর সরাতে পারছে না। গতদিনের বলটা যেমন দ্রুত নেমে এসে রাজার মধ্যে ঢুকে

পড়েছিল, এটার মধ্যে সেরকম কোন তাড়াহুড়ো লক্ষ করা গেল না। বেশ ধীরস্থির।

মনে হলো সৌরভ কী সিদ্ধান্ত নেয়, তার অপেক্ষায় আছে ওটা। যেন অনাকাঙ্ক্ষিত অতিথি হতে চায় না। যেখানে সাদর আমন্ত্রণ জানানো হবে না, সেখানে যেতে রাজি নয়।

'তুমি বলেছ তুমি যা খুশি তাই করতে পারো,' দম ফিরে পেয়ে টিরাকে বলল তিয়ানা। 'ঠিক আছে, মানলাম। পৃথিবী ছেড়ে যেতে পারো তুমি?'

মুহূর্তের জন্য দ্বিধাগ্রস্ত দেখাল মেয়েটাকে। 'আমি যেখানে খুশি যেতে পারি।'- সৌরভের একটা হাত ধরল। 'সৌরভ আমার সঙ্গে যোগ দিলে আমরা দু'জন সমগ্র নক্ষত্রমণ্ডলী ঘুরে বেড়াব।'

'তুমি সারা আন্টিকে চেনো?' জ্যোতি জিজ্ঞেস করল।

টিরার চেহারা চোখের পলকে ফ্যাকাসে হয়ে উঠল। মাথা নাড়ল। 'কে সে? চিনি না।'

মুখে যাই বলুক, কথাটা যে সত্যি নয়, তা ওর চেহারা দেখেই বোঝা গেল।

বাঁকা হাসি ফুটল তিয়ানার মুখের কোণে। 'ঢাকার খিলগাঁয় থাকেন। অনেকে ডাইনি ডাকে। যিনি ক্রিস্ট্যাল বলে অতীত-ভবিষ্যৎ দেখতে পারেন। চিনেছ?'

আরও অন্ধকার হয়ে গেল ওর চেহারা। তবু অস্বীকার করল। 'না। চিনি না।'

'সারা আন্টি কিন্তু তোমাকে চিনেছেন,' বলে সৌরভের দিকে

ফিরল জ্যোতি। 'আমি আন্টিকে ওর কথা জানিয়েছি উনি বল দেখে বলেছেন, টিরার দেহের মধ্যে যে আত্মাটা আছে, সেটা ওর নিজের্র নয়। ওটা এই পৃথিবীরই নয়। হাজার হাজার বছর আগে অন্য কোন গ্রহ থেকে পৃথিবীতে এসে আটকা পড়ে গিয়েছিল কয়েক হাজার ভিনগ্রহবাসী আত্মা। ওটা তার মধ্যে একটা।'

'কী বলছিস?' হতভম্ব দেখাল সৌরভকে। 'তারপর?'

'দেড়শো বছর আগে একদিন টিরাকে নাগালের মধ্যে পেয়ে ওর ওপর ভর করেছে আত্মাটা। ওই যে আকাশে যত বল দেখতে পাচ্ছিস, ওর প্রত্যেকটাতেও একটা করে আত্মা আছে ওরা সব একসঙ্গে দুনিয়াতে এসেছে। এই পাহাড়েই থাকে ওগুলো। তার মধ্যে থেকে একটা টিরার মধ্যে ঢুকে পড়েছে বুঝতে পেরেছিস?'

টিরার দিকে ফিরল। 'এখন তোমার দেহের ওপর নির্ভর করেই অনন্তকাল বেঁচে থাকবে ওটা। অর্থাৎ তুমি চাও আর না চাও, তোমার দেহ আত্মাটার ইচ্ছেমত চলবে তুমি নিজের ইচ্ছায় একটা আঙুলও নাড়তে পারবে না।'

সৌরভের হাত ছেড়ে এক পা পিছিয়ে গেল টিরা রেগে চেঁচিয়ে উঠল। 'এটা একটা ডাহা মিথ্যে কথা! আমি একজন সম্পূর্ণ মানুষ। আমি যে জীবন যাপন করি, তোমাদের মত মরণশীলদের কাছে তা কেবল স্বপ্নের ব্যাপার। আমার অন্ত নেই। আমার বিনাশ নেই। আমি কখনও মরব না। কাজেই আমি সুখী। অনেক সুখী।'

জ্যোতি আর তিয়ানা একযোগে কথা বলতে শুরু করায় কারও কথা শোনা গেল না। তবে সৌরভেরটা স্পষ্ট শোনা গেল।

'না, টিরা!' মেয়েটার দিকে ফিরে বলল ও। 'তোমার মনে সুখ নেই। আমি তোমাকে যতটুকুই দেখেছি, তার বেশিরভাগ সময়ই বিষণ্ন থাকতে দেখেছি। এখন সেটা আরও বেশি বেশি দেখতে পাচ্ছি। এরকম নিঃসঙ্গ মাঝেমধ্যে আমরাও প্রত্যেকে বোধ করে থাকি। কিন্তু আমাদের বন্ধু আছে, মা-বাবা আছে, ভাই-বোন আছে, আমাদের সবার যার যার জীবন ধারণের নিজস্ব পদ্ধতি আছে বলে সে নিঃসঙ্গতা আমরা সহ্য করে নিতে পারি। কিন্তু তুমি তা পারো না। কারণ অসময়ে তোমার পাশে দাঁড়াবার, তোমাকে অনুপ্রেরণা দেয়ার সান্ত্বনা দেয়ার মত কেউ নেই। সবচেয়ে বড় কথা, তুমি তোমার নিজের জীবন নিজে নিয়ন্ত্রণ করতে পারো না। আর কেউ নিয়ন্ত্রণ করে সেটা।'

পরপর আরও কয়েকটা বাজ পড়ল। বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল ঘন ঘন।

বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল।

টিরার গালে দু'ফোঁটা চোখের পানি দেখা গেল। কাঁদছে? নাকি বৃষ্টির পানি?

কে জানে!

আবার কাঁপতে শুরু করল ও। অসহায় ছোট্ট শিশুর মত এদিক-ওদিক তাকাল। হয়তো কেউ সান্ত্বনা বা অনুপ্রেরণা দেওয়ার মত আছে কি না খুঁজল।

'আমার একটা অংশ কখনও এই পাহাড় থেকে নামেনি,

কথাটা সত্যি,' দুর্বল গলায় স্বীকার করল টিরা। 'কেননা সেটা হয়তো এখানেই কোথাও মরে পড়ে আছে।'

ঘন ঘন চমকাতে থাকা আকাশের দিকে তাকাল ও। মাথার উপরে ঝুলে থাকা বলটা দেখল। কেন কে জানে, পা থেকে মাথা পর্যন্ত ভীষণভাবে শিউরে উঠল টিরার। আপনমনে মাথা নাড়ল।

সৌরভের উদ্দেশে ফিস-ফিস করে বলল, 'এখন অবশ্য সেসব কোন ব্যাপার নয়। তুমি যদি আমার সঙ্গে আসতে না চাও, আমি কিছু মনে করব না, সৌরভ। আমি তোমাকে জোরও করব না। তোমাকে দলে টানার জন্য মিথ্যে বলতে হয়েছে বলে কিছু মনে কোরো না। মিথ্যে বলা বোধহয় আমার ভেতরের জিনিসটার কাছে স্বাভাবিক ব্যাপারে দাঁড়িয়ে গেছে। কাজটা আমি করতে চাইনি। বিশেষ করে তোমার বেলায় তো অবশ্যই না।'

চলে যাওয়ার জন্য পা বাড়াল টিরা। সৌরভ তাড়াতাড়ি ওর পথরোধ করে দাঁড়াল।

'দাঁড়াও, টিরা।' জ্যোতির দিকে ফিরল। 'ওকে আমরা কোন সাহায্য করতে পারি না?'

তিয়ানা হাতের ব্যাটারি কেবল তুলে ধরল। 'পারি। শক দিয়ে ওর ভেতরের আত্মাটাকে বের করে দিতে পারি।'

'এত সহজে কাজ হবে?' অবাক হলো সৌরভ।

'হবে, হবে!' জোর দিয়ে বলল জ্যোতি। 'শক খেলে বাপ বাপ করে পালাবে ওটা। দেখছিস না, বিদ্যুৎ চমকাতে দেখলে টিরা ভয়ে কেমন ফ্যাকাসে হয়ে উঠছে? আসলে তো ভয়টা টিরা

পাচ্ছে না। পাচ্ছে ওর ভেতরেরটা।'

ওদের অলক্ষে সরে পড়তে যাচ্ছিল মেয়েটা। সৌরভ ঘুরেই পিছন থেকে ওর দুই বাহু চেপে ধরল। 'থামো, টিরা! তোমাকে সাহায্য করার একটা সুযোগ দাও আমাদেরকে।'

কিন্তু টিরা দৃঢ়ভাবে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল। 'আমাকে সাহায্য করার মত কোন অবস্থানে নেই তোমরা। ওই ব্যাটারিতে শক্তি বলতে গেলে নেই। যা আছে, তা খুবই সামান্য। ওই শক্তি দিয়ে আমার কিছুই করতে পারবে না। তা ছাড়া এখন এমনিতেও অনেক দেরি হয়ে গেছে।' করুণ হাসি ফুটল ওর মুখে।

কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করে আবার পা বাড়াল মেয়েটা–চলে যাচ্ছে। কিন্তু সৌরভ আবার বাধা হয়ে দাঁড়াল। দু'হাতে ধরে ফেলল ওকে। 'জ্যোতি, তাড়াতাড়ি!'

এক মুহূর্ত পর আকাশে বিদ্যুৎ চমকে উঠতেই তিয়ানা ওটার সঙ্গে যুক্ত তারগুলো টিরার মাথার উপরে ঝুলে থাকা বলটার দিকে গায়ের জোরে ছুঁড়ে দিল।

একটা তারের খোলা প্রান্ত টিরার মাথার তালু স্পর্শ করল।

ঠিক তার এক মুহূর্ত পরই কালো আকাশ ঝলসে উঠল চোখ ধাঁধানো তীব্র নীলচে আলোয়। মুহূর্তের মধ্যে আকাশের এক মাথা থেকে আরেক মাথা পর্যন্ত সাপের মত এঁকেবেঁকে ছুটে গেল।

তারপর বাজ পড়ল!

ঠিক ব্যাটারির তারগুলোর উপরে।

মুহূর্তের জন্য অন্ধ, বধির হয়ে গেল ওরা।

তারপর দেখা গেল আলোর বলটা নেই। গায়েব হয়ে গেছে।

দূর হয়ে গেছে অশুভ আত্মা।

তার পরপরই শুরু হলো ঝমাঝম বৃষ্টি।

ঘুরে শহরের দিকে তাকাল ওরা। একে সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, তারউপর বৃষ্টি, তাই দূরের কিছু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। তবু ওদের মনে হলো, বাকি সবগুলো বলও উধাও হয়ে গেছে কক্সবাজারের আকাশ থেকে।

অশুভ আত্মাগুলোর আগ্রাসনের হাত থেকে রক্ষা করা গেছে মানবজাতিকে।

কাজে লেগেছে ওদের প্ল্যান।

কিন্তু কীসের বিনিময়ে?

টিরা মাটিতে দলা পাকিয়ে পড়ে আছে। দম নিচ্ছে বলে মনে হয় না। বেঁচে আছে না মরে গেছে, ঠিক নেই।

জ্যোতি, তিয়ানা আর সৌরভ ছুটে গেল ওর দিকে। ধরাধরি করে তুলে বসাল। কিন্তু চোখের পাতা কাঁপছে না ওর। মনে হয় না বেঁচে আছে।

ওদের তিনজনের চোখেই পানি দেখা দিল। টিরাকে ধরে নীরবে কাঁদছে। কী ঘটে গেছে, সে ব্যাপারে নিশ্চিত নয় কেউ।

একটু পর হঠাৎ করে চোখ মেলল টিরা। দ্রুত এদিক-ওদিক তাকিয়ে কী যেন খুঁজতে লাগল। হাত তুলে বৃষ্টি থেকে চোখ আড়াল করল। হতবিহ্বল। ওদের উপর চোখ পড়তে সচকিত হলো মেয়েটা। কুঁকড়ে গেল।

'তোমরা কারা? এখানে এলে কী করে?'

'তুমি টিরা?' অবাক বিস্ময়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল

তিয়ানা।

'হ্যাঁ কিন্তু তুমি কে?'

তিয়ানার মুখে অনাবিল হাসি ফুটল। চোখের পানি মুছে বলল, 'এটা কত সাল, টিরা?'

'আঠারোশো ছেষট্টি,' একটুও চিন্তা না করে জবাব দিল মেয়েটা। 'কিন্তু...তোমরা আমার নাম জানলে কী করে?'

'তুমি মনে হয় জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলে, তাই না? আচ্ছা, কী ঘটেছিল মনে করতে পারো?'

চোখ কুঁচকে কিছু ভাবল টিরা। 'আমি এখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম। তারপর পিছন থেকে কে যেন ধাক্কা দিল। পড়ে গেলাম। তারপর...তারপর...কিন্তু তখন বৃষ্টি ছিল না। তোমরাও কেউ...'

'ছিলাম না,' ওর মুখের কথা কেড়ে নিল তিয়ানা। 'ঠিক বলেছ তুমি। থাকব কী করে, বলো! তুমি পড়ে গিয়েছিলে দেড়শো বছর আগে। আর আমরা...'

'কী বললে!' চোখ কপালে উঠে গেল টিরার। নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরে কিছু ভাবল। 'এটা কত সাল?'

'দুই হাজার পাঁচ!' উর্মি বলল।

'অ্যাঁ!' এমন চেহারা হলো টিরার, ভয় হলো এখনই বুঝি মাথা ঘুরে পড়ে যাবে। 'কী বললে?'

'তার আগে তুমি বলো দেখি, তোমার বাড়ি কোথায়? তুমি এই পাহাড়ে কী করছিলে?'

'আমার বাড়ি চট্টগ্রামে। আমি মা-বাবার সঙ্গে ছুটিতে এসেছিলাম। তারপর...তারপর...! আমার মা-বাবা কোথায়?

আমার…!’

কী ভেবে থেমে গেল টিরা। হঠাৎ করে পানি দেখা দিল ওর অদ্ভুত সুন্দর দুই চোখে। ‘এটা সত্যি সত্যি দুই হাজার পাঁচ সাল? তোমরা ঠাট্টা করছ না তো?’

তিয়ানা পাশ থেকে জড়িয়ে ধরল ওকে।

মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। ‘তোমার বুদ্ধি আছে, টিরা। তুমি নিশ্চয়ই বোঝো এসব নিয়ে কেউ ঠাট্টা করে না!’

হাউমাউ করে কেঁদে উঠল মেয়েটা। ‘তোমরা বলতে চাও আমার মা-বাবা মরে গেছে?’

‘হ্যাঁ, টিরা।’

‘তা হলে আমি এখনও বেঁচে থাকলাম কী করে? আমি মরিনি কেন?’

‘মাত্র ছয়দিন আগে তোমার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে আমাদের,’ জ্যোতি বলল। ‘কিন্তু প্রথম থেকেই তোমার কিছু কিছু আচরণ সন্দেহজনক মনে হওয়ায় তোমার ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামিয়েছি আমরা। খোঁজ নিয়ে জানতে পেরেছি, তুমি যখন মা-বাবার সঙ্গে এখানে বেড়াতে এসেছিলে, তখন অশুভ একটা আত্মা তোমার মধ্যে ঢুকে পড়ে। বাইরের অজানা কোন গ্রহ থেকে আসা অনেকগুলো আত্মার মধ্যে একটা ছিল সেটা। তাদের নাকি নিজেদের গ্রহে বাস করার মত পরিবেশ ছিল না। তাই নতুন বাসস্থানের খোঁজে পৃথিবীতে এসেছিল। তারপর কোন কারণে আটকে যায় এখানে। আর ফিরে যেতে পারেনি।’

‘তারপর?’ টিরা চোখের পানি মুছে সোজা হয়ে বসল।

'ওগুলো অশুভ হলেও অমর আত্মা। তাই তুমি নিজেও অমর হয়ে গিয়েছিলে।' হাসল জ্যোতি। 'আর আজ সৌরভকেও অমর করে ফেলার ব্যবস্থা করেছিলে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাদের বাধার কারণে ব্যর্থ হয়েছ।'

'এবং আজ আবার তুমি নিজেকে ফিরে পেয়েছ,' তিয়ানা বলল। 'তুমি আবার নশ্বর হয়ে গেছ।'

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল টিরা। 'মা-বাবা নেই...তা হলে কী লাভ হলো? আমি এখন কোথায় যাব? কার কাছে থাকব?' আবার কাঁদতে শুরু করল ও।

তিয়ানা ভুরু কুঁচকে কী যেন ভাবল। তারপর কী মনে হতে হেসে জ্যোতির কানে কানে বলল কিছু।

মাথা ঝাঁকাল ও। 'চলো, টিরা,' হাত ধরে দাঁড় করাল ওকে। 'তোমাকে তোমার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

'মানে?' কান্না থামিয়ে মুখ তুলল মেয়েটা। এক এক করে ওদের মুখের দিকে তাকাতে লাগল।

'মানে পরে বুঝতে পারবে। এখন চলো তো!'

উঠে দাঁড়াল ওরা।

পাহাড়ের পায়ের কাছে অনেকগুলো টর্চলাইট দেখা গেল। ইমরান, উপম, ঊর্মি আর রাজার গলা শোনা যাচ্ছে। সরোয়ার সাহেব আর প্রতিবেশী অঞ্জনের গলাও শোনা যাচ্ছে।

জ্যোতি আর তিয়ানার নাম ধরে ডাকাডাকি করছে সবাই।

সতেরো

'আঙ্কেল!' অনেক দ্বিধার পর বলল জ্যোতি। 'একটা কথা বলব আপনাকে!'

'নিশ্চয়ই, বাবা! কী কথা?'

'ঊর্মি আপু, তিয়ানা বা টিরার মত আপনারও যদি একটা মেয়ে থাকত, কত মজা হত না?'

হাসতে গিয়েও পারলেন না সরোয়ার হোসেন। একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'আল্লাহর ইচ্ছার উপর তো কিছু করার উপায় নেই, বাবা!'

'ধরুন, তিনি যেভাবে হোক আজ একটা মেয়ে জুগিয়ে দিলেন আপনাকে,' তিয়ানা বলল। 'আপনি কি খুশি হবেন না?'

মুখ খোলার আগে ওদের সবার উপর চোখ বুলিয়ে নিলেন সরোয়ার সাহেব। স্ত্রীর দিকেও তাকালেন। দু'জনের চেহারাতেই সন্দেহ ফুটল।

'তুমি কী বলছ, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না,' বললেন তিনি।

'আঙ্কেল, আল্লাহ একে আপনাদের মেয়ে করে পাঠিয়েছেন,' টিরাকে দেখিয়ে বলল জ্যোতি। 'আপনাদের কোন সন্তান নেই,

ওরও মা-বাবা নেই। একে আপন করে নিতে পারলে আপনাদের দুই পক্ষেরই ভাল হবে।'

আবার বোকার মত ওদের দিকে তাকাতে লাগলেন তাঁরা। 'বুঝলাম না,' বললেন সরোয়ার সাহেব। হতভম্ব হয়ে গেছেন। ওদিকে তাঁর স্ত্রী ঘন ঘন টিরার দিকে তাকাচ্ছেন। মনে মনে কিছু হিসাব করছেন হয়তো।

'আমি একটা গল্প বলি,' ঊর্মি বলল। 'আজ থেকে দেড়শো বছর আগের কথা। চট্টগ্রাম থেকে একটা পরিবার কক্সবাজারে বেড়াতে এসেছিল। বাবা-মা আর তাঁদের একমাত্র মেয়ে। ছোট একটা পরিবার। আর দশটা সাধারণ পরিবারের মত সহজ-সরল, হাসিখুশি। তারপর...।'

প্রথম পর্ব শেষ করে একটু বিরতি দিল ও। 'সেই মেয়েটি এই টিরা। আজ আগের জীবন ফিরে পেয়েছে ও। কিন্তু মা-বাবাকে পায়নি। পৃথিবীতে ও সম্পূর্ণ একা। ওকে দেখাশুনা করার মত কেউ নেই। মাথা গোঁজার কোন ঠাঁই নেই।'

ওর বলা শেষ হতে সরোয়ার দম্পতি অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকলেন ওর দিকে। সহানুভূতি উথলে পড়ছে সে চাউনি থেকে। এক মুহূর্ত মাত্র, তারপরই ঊর্মির গল্প বলার কারণ অনুমান করতে পেরে চাপা উচ্ছ্বাসে উদ্বেল হয়ে উঠলেন সরোয়ার সাহেব।

চোখ মুছতে মুছতে টিরাকে বুকে টেনে নিলেন তিনি। 'কে বলেছে কেউ নেই?' কান্না জড়ানো কণ্ঠে কোনমতে বললেন। 'আমরা আছি না? আজ থেকে টিরা আমাদের সন্তান। আমাদের

মেয়ে। আমরাই ওর সব।

ওদিকে মিসেস সরোয়ার আনন্দে কথা বলার ক্ষমতাই হারিয়ে ফেলেছেন। হাতের কাছে যাকে পাচ্ছেন, পাগলের মত তাকেই বুকে জড়িয়ে ধরতে লাগলেন। সবশেষে টিরাকে সরোয়ার সাহেবের কাছ থেকে প্রায় ছিনিয়ে নিলেন তিনি। চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিতে লাগলেন ওর সারা মুখমণ্ডল।

একই সঙ্গে কী সব আবোল-তাবোল বকছেন যেন।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে সেই অপরূপ দৃশ্য দেখতে লাগল হরর ক্লাবের ওরা সাতজন। ওদের কারও কারও চোখের কোণও চিক-চিক করছে।

অনাবিল আনন্দ আর তৃপ্তির কান্না কাঁদছে ওরা।

***

হরর ক্লাব

গোলক রহস্য

টিপু কিবরিয়া

ছুটিতে কক্সবাজারে বেড়াতে এসেছে
হরর ক্লাবের সাত সদস্য। টিরা নামের রহস্যময় এক মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হলো ওদের। বাবা কী কাজ করেন, জানে না সে। বাসা কোথায় বলতে চায় না।
রহস্যের গন্ধ পেয়ে গেল জ্যোতিরা।
একদিন টিরা একটা লেকের কাছে নিয়ে গেল
হরর ক্লাব সদস্যদেরকে । সেখানে আজব এক দৃশ্য দেখল ওরা।
ওদের গজ পঞ্চাশেক সামনে, মাটি থেকে দশ গজ
উপরে ফুটবলের মত কিছু আলোর বল ভেসে বেড়াচ্ছে।
বিভিন্ন রঙের বল।
সাদা, হলুদ, লাল, কমলা!
কী ওগুলো?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০